শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য

বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ
২৫/২, মোহনবাগান রো,
কলিকাতা-৪.

প্রথম প্রকাশ—১লা বৈশাখ ১৩৬০

প্রকাশক
শ্রীশক্তিকুমার ভাদুড়ী
দি বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ
২৫।২, মোহনবাগান রো.
কলিকাতা—৪

মুদ্রাকর
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে
নিউ মদন প্রেস
৯৫, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট্
কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদ পট
খালেদ চৌধুরী
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
স্টাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট্
কলিকাতা

বাঁধাই
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
৬১।১, মির্জাপুর স্ট্রীট্,
কলিকাতা

দাম—দু'টাকা আট আনা।

শ্রীমতী মৃণাল দেবী

প্রিয়তমাসু—

এই বইয়ের ধারাবাহিক কিস্তী যখন 'সচিত্র ভারতে' বেরোচ্ছিল, তখন তুমি যদি ওই ভাবে আমাকে তাগিদ না দিতে, তাহ'লে 'বৈধায়কী আলস্যে' এটি আর শেষ হতোনা। অতএব এই বইখানির যা কিছু স্বত্ব সব তোমার। দান যতো ছোটই হোক, গ্রহীতার ঔদার্য্যে তা বড়ো হয়ে ওঠে। নয় কী?

জিয়াগঞ্জ
মুর্শিদাবাদ
শুভ বর্ষারম্ভ ১৩৬০

আশীর্বাদক
শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

প্রাক্-পাঠ্য

"সচিত্র ভারতের" সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত দিলীপ সেনগুপ্তকে যখন 'দিনগত'র মাত্র কুড়িটি পাতা পড়ে শোনাই, তখনই তিনি সেটি কেড়ে নিয়ে ছাপতে শুরু করেন। এই সূত্রে যে মধুর সখ্যতা স্থাপিত হয়েছে আমাদের মধ্যে, তাকে ছোট করা হবে, যদি আমি শুক্‌নো একটু ধন্যবাদ দিয়ে আমার কর্তব্য শেষ করি। অতএব তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই গল্প আরম্ভ ও শেষ করার মধ্যে যাঁরা অপার ধৈর্য্য ও অসাধারণ সহিষ্ণুতার সঙ্গে আমাকে তীব্র তাগিদ দিয়ে এটিকে শেষ করিয়েছেন, তাঁরা হচ্ছেন কল্যাণীয় শ্রীমান অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় (টুলু) ও কল্যাণীয়া শ্রীমতী মৃণাল ভট্টাচার্য্য। আজ তাঁদেরও আশীর্বাদ জানাই। বিহার সাহিত্য ভবনের কর্মাধক্ষ বন্ধুবর শ্রীশক্তিকুমার ভাতুড়ী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এটিকে পুস্তকাবদ্ধ করেছেন বলে তাঁকেও ধন্যবাদ জানাই।

'দিনগত' অসাধারণ বা অস্বাভাবিক কোন কাহিনীর বিবৃতি নয়,—প্রাত্যহিক দিনাতিবাহনের মধ্যে মধ্যে যে সব ছোট ছোট আশ্চর্য ঘটনা বা অভিনব চরিত্র চোখে পড়েছে, তাদের অনুসরণ বা অনুধাবন করতে গিয়ে ধোয়া কাপড় জামার অন্তরালে যে বিপুল, বিচিত্র এবং বিসদৃশ কাহিনীর মুখোমুখী হয়েছি 'দিনগত' তারই সামান্য একটু-খানি বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

সাহিত্যিক্যের পোষাক সমাজ-সেবক বা সমাজ-সংস্কারকের পোষাক নয়, আমার মতে তার পোষাক হওয়া উচিত চারণের পোষাক।

সে চারণের গান পুরাতন জাতীয় ঐতিহ্যের পুনরুক্তির গান নয়,—সে গান জাতির আসন্ন সর্বনাশের সাবধান বাণী। আমি 'দিনগত'র মাধ্যমে সেই সাবধান বাণীই উচ্চারণ করবার চেষ্টা করেছি মাত্র। নল রাজার পদ প্রক্ষালণের অন্যমনস্কতায় কলি প্রবেশ করেছিলেন যে পথে,—আধুনিক ছেলেমেয়ে বা বাপমায়ের অন্যমনস্কতার সেই পথ দিয়েই বর্তমান যুগের কলি প্রবেশ করে। এর ফলে দেহের বা মনের যে ভাঙচুর ঘটে, তার মেরামতের ইঙ্গিতও আমি করবার চেষ্টা করেছি, জানিনা সফলকাম হয়েছি কিনা।

এটা আমি স্বীকার করি যে, প্রবহমান কাল যে পথ দিয়ে বয়ে যায়, সে পথের মাঝে মাঝে সে তার ধ্বংস আর সৃষ্টির বিক্ষিপ্ত ইতিহাস রেখে যায়। আজকের দিনে সেই কাল চলেছে আমাদের ঘরের মধ্য দিয়ে, আমাদের মনের মধ্য দিয়ে। আমি বলবো যে তার চলে যাবার পর সবই যেন আমাদের নিশ্চিহ্ন হয়ে ধুয়ে মুছে না যায়, কিছু অবলুপ্ত অবশেষ যেন থাকেই থাকে, নইলে আগামী দিনের বাঙালী পিছন ফিরে কিছু দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হবে, বিভ্রান্ত হবে, জগৎ সভায় বে-ইজ্জৎ হবে।

পরিশেষে আর একটি কথা বলার দরকার মনে করি। এই বইয়ের চরিত্র বা ঘটনা সবই আমার কল্পনার সৃষ্টি! তা সত্বেও যদি জীবিত বা মৃত মানুষের বা ঘটনার কোন সাদৃশ্য এতে এসে গিয়ে থাকে, তবে তাকে নিতান্ত আকস্মিক বলে মেনে নিতে হবে।

জিয়াগঞ্জ
মুর্শিদাবাদ,
তেরশো ষাটের পয়লা বৈশাখ।

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

সকাল ৭টা থেকে ১০টা

ভোর নিশ্চয়ই হয়েছে। চোখ বুঁজেই মনে মনে ভাবলো কমলেশ। ভোর না হলে মীনা কখনই চা খেতে ডাকতোনা। প্রভাত হয়েছে নিশ্চয়ই। বিছানার যে পাশে মীনা শোয়—নিঃশব্দে ডান হাতখানি সেইদিকে বাড়িয়ে দিয়ে অনুভব করলো কমলেশ—মীনা এখনো শুয়েই আছে কিনা।

—হোথা নয়, হোথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে। এই বলে মীনা হেসে উঠলো। চোখ না খুলেই কমলেশ ভাবলো—তাহ'লে ঠিকই ভোর হয়েছে। আর কোন সন্দেহ নেই। প্রতীচ্য সতীনের ঘর থেকে দিনকর আবার এলেন প্রাচ্য প্রেয়সীর ঘরে।

—ওগো! তোমার চা এনেছি যে! মীনার গলা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মীনার ঠাণ্ডা দক্ষিণ করতল কমলেশের কপাল স্পর্শ করলো। আঃ! কর্মমুখর নীচের তলার আমন্ত্রণ বয়ে এনেছে মীনার এই দক্ষিণ পাণি। উঠতে হবে, এখনই বিছানা ছেড়ে উঠতে হবে। দাঁত মাজতে হবে, মুখ ধুতে হবে, আর এক পেয়ালা চা খেতে হবে, তারপর স্নান করতে হবে, তারপর··· ? তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে বেরোতে হবে। কে বলতে পারে, হয়তো আজকের এই বেরোনোই শেষ বেরোনো। হয়তো ইলেক্‌ট্রিকের তার ছিঁড়ে গিয়ে শেষ হয়ে যেতে পারে জীবন ···নয়তো বাসে বাসে ধাক্কা লেগে চুরমার হতে পারে দু'পক্ষ। কিংবা···। কিন্তু, যদি ঘটে···তবে ঘটতে এখনো কিছু দেরী আছে···অতএব গাত্রোৎপাটন করা যাক।

আস্তে আস্তে চোখ মেললো কমলেশ। ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে আছে হাস্যময়ী পূর্ণ যৌবনা মীনা। সদ্যস্নাতা···, কপালের উপর দু'তিন গাছা চূর্ণ অলক যেন স্কুল-পালানো ছেলের মতো অসময়ে··· অস্থানে···সময় কাটাচ্ছে। পরিপুষ্ট আরক্ত দু'খানি ঠোঁট, শাদা ঝক্‌ঝকে ধারালো দাঁতগুলিকে ফ্রেমে বাঁধাই করেছে।

অপলক চোখে মীনার দিকে চেয়ে রইলো কমলেশ। মন বললো—এ কখনই সত্যি নয়। তার জীবনে মীনার এই আবির্ভাব সুখ-স্বপ্নের মতো। নইলে তার মতো সামান্য মানুষের কাছে এই রাজার দুলালী বাঁধা পড়লো কিসের আকর্ষণে? কিসের মোহে সে দিবারাত্রি পড়ে আছে কমলেশের আয়ত্বের মধ্যে? কেন সে জ্বালিয়ে দিলো দারিদ্র্যের অমা-নিশীথিনীতে যৌবন-সম্ভোগের এই দুরন্ত দীপাবলী? কেন সে এত অকুণ্ঠিতা? এমন সমর্পিতা?

—হাসছো যে! বললো মীনা।

—উঁ?

—হাসছো কেন?

—কালকের রাত্রির কথা ভাবছি। ছোট্ট ক'রে বললো কমলেশ।

—আ-হা! মীনার কণ্ঠে কৃত্রিম কোপ।—নাও, চা নাও।

—কাল্‌কে কী কী বলেছো মনে আছে তোমার?

—আমার মনে থেকে কাজ নেই গো, তুমি চা নাও। এই বলে চায়ের পেয়ালাটি মাথার কাছে টিপয়ের উপর রেখে দিয়ে মীনা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বেশ বোঝা যায় লজ্জা এবং হাসি চাপতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। গেল বটে সে চলে, কিন্তু ঘরের শূন্যে রেখে গেল তার উপস্থিতির সাক্ষ্য স্বরূপ শিউলীর মৃদু সুবাস। শিউলী সেণ্ট মীনার খুব ফেভারিট! ও বলে—শিউলীর গন্ধের মধ্যে পৃথিবীর মধুরতম মুহূর্তের স্মৃতি লুকানো আছে। সে মুহূর্তের নাম শরৎকাল। ফুলের মধ্যে শিউলী হচ্ছে মীনার সখী, তার আত্মীয়া। শিউলীর যেমন কোন চাওয়া নেই, পাওয়া নেই, দাবী নেই, ভোর না হতেই সে তার সোনার অঙ্গ ধুলোয় মিশিয়ে নিঃশব্দে পড়ে থাকে পদদলিতা হবার, ধূলি-দলিতা হবার কামনায়, মীনারও জীবন দর্শনও তাই। সে চায়না তোমার কাছ থেকে কিছু, পাওয়ার স্বপ্ন নেই তার, শুধু দয়িতের কাছে তার বিনম্র কামনা—অপরূপ দেহ সম্পদের অধিকারিণী সে, তার ভালবাসার তপস্যায় সেই দেহকে সে ফুলের মতো নিবেদন করেছে নিঃসর্তে তার প্রেমাস্পদের কাছে। সেই অঞ্জলি গ্রহণ ক'রে তুমি তৃপ্ত হও, প্রসন্ন হও। এই তার স্বপ্ন, এই তার প্রার্থনা।

চায়ের বাটি টেনে নিয়ে চুমুক দিলো কমলেশ। আশ্চর্য চা তৈরী করে মীনা। চায়ের দেশের মেয়েতো! ওর বাবা আসামের পাঁচটি চা বাগানের মালিক। থাকেন গৌহাটিতে। সংসারে দুটি মাত্র মেয়ে, এক স্ত্রী আর নিজে তিনি। অগাধ ঐশ্বর্য, অসম্ভব প্রতাপ। নাম তাঁর বিনোদ বিহারী মজুমদার। নিজে গরীবের ছেলে ছিলেন। আপন প্রতিভায় ও কর্মনিষ্ঠায় তিনি আজ চা বাগানের মালিকদের শীর্ষস্থানে।

গৌহাটি থেকে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে মীনা এল কোলকাতায় পড়তে। থাকে মেয়েদের হস্টেলে। প্রায় প্রতিদিন একখানি ক'রে চিঠি আসে মায়ের কাছ থেকে কিম্বা বাপের কাছ থেকে। সপ্তাহে সপ্তাহে আসে টাকা। সত্যি কথা বলতে কি, এত টাকা যদি না আসতো মীনার হাতে, তাহ'লে বোধ হয় সে এতখানি স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করতে পারতোনা।.... তবে এ কথাও ঠিক যে মীনা যদি স্বাধীনভাবে চলা ফেরা না করতো, তবে কমলেশের কপালে তো এই দুর্লভ পাওয়া ঘটে উঠতো না।

বিছানা ছেড়ে উঠে কমলেশ ডাকলো—বংশীধর! বংশীধর!

—যেছি আজ্ঞা। বিনীত প্রত্যুত্তর ভেসে এল।

—আসতে হবেনা আজ্ঞা! বললো কমলেশ।—আপনি বাথরুমে সাবান-টাবানগুলো দেখে দিন—আর কাপড় চোপড়গুলো।

—ঠিকই আছে আজ্ঞা। বংশীধরের জবাব।

বাথরুমে ঢুকলো কমলেশ। কালকে রাত্রে শোনা মীনার মুখের রবীন্দ্র সংগীতটি মনে পড়লো হঠাৎ। "উজাড় করে লওহে আমার সকল সম্বল।" গুণ গুণ ক'রে লাইনটি গাইতে গাইতে কমলেশ তার দৈনন্দিন কর্তব্য সমাধা করতে লাগলো...।

ব্রেকফাস্ট টেব্‌লে বসেছিল মীনা। সে অপেক্ষা করছিল কমলেশের। হাতে একটি সেলাই। কমলেশের জন্যে একটি পুলওভার ক'রে দেবার ইচ্ছা, সময় পাচ্ছেনা মীনা, তা' শেষ করবে কবে? কমলেশকে ভালবেসে, তার সেবা ক'রে, তাকে স্পর্শ ক'রে সময়ই নেই মীনার। এ যেন মাঝ নদী দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন

স্রোতে ভেসে যাওয়া। চলার আনন্দেই চলা, চাওয়ার গতির সঙ্গে পাওয়ার রতি। কূল অনের দূর, জল অনেক গভীর—তাহোক। চলতে চলতে দম ফুরিয়ে গেলে ডুবে যাবে দু'জনে প্রেমের সমুদ্রের অতলস্পর্শতার মাঝখানে; তবু হাজার লোকের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে দিয়ে—হাঁপাতে হাঁপাতে আধমরা অবস্থায় সংসারের তীরে তারা উঠবে না। নাঃ!

সত্যি! এক এক সময় ভাবতে অবাক লাগে মীনার,—যে, কতো দ্রুত বদল হয়ে গেল—তাদের পরিচয়ের পটভূমিকা। প্রথমে ছিল লেডীজ হস্টেল, পরে হ'ল অনুমাসীর বাড়ীর ড্রয়িং রুম, তারপর হ'ল আউটরাম ঘাট, ডায়মণ্ড হারবারের ডাক বাংলো এবং—! সব শেষে এই বাড়ী, এই ঘর।

এটা ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে—তা' নিয়ে চুলচেরা আলোচনা করতে "মন মোর নহে রাজী।" বরঞ্চ এইটা বলা ভাল, যা হবার তাই হয়েছে। এটুকু যদি না ঘটতো, তবে হয়তো কোথায় চলে যেতো তার জীবন, তার কিছু ঠিক ঠিকানা নেই। সত্য এসেছে সুন্দরের হাত ধরে—শিব যদি না আসে নাইবা এলো।

কমলেশ এখনো আসছে না কেন? এই ভাবে রোজ সকালে হুড়্ হুড়্ ক'রে মাথায় জল ঢেলে একটা অসুখ বিসুখ বাধাবে দেখছি! শেষকালে মরতে হবে সেই তাকেই। আর কেউ তখন আসবে না। এমনিতেই তো মানুষটির গুণের ঘাট নেই। সন্ধ্যার অন্ধকার হ'লেই—আর কোন কথা নেই। 'জনিওয়াকার' 'হোয়াইট লেব্‌ল', 'জনহেগ' তো আছেই—পয়সাকড়ি হাতে না থাকলে দিশী আছে।

খুব চুপ ক'রে বসে ভাবলে হাসি পায় মীনার। কি ক'রে যে এ ঘটনা সম্ভব হ'ল, অবশ্য আজ তার পরিবারে সকলেই জেনে গেছে। জানতে বোধ হয় আর কারুরই বাকী নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কি ভাবে জেনেছে? তবে যে ভাবেই জানুক, তাতে কিছু যায় আসে না তাদের!

দরজার ওপর এসে দাঁড়াল কমলেশ। দু'জনের চোখাচোখী হ'তে দু'জনেই হাসলো। কমলেশ এগিয়ে এসে বিপরীত দিকের চেয়ারে বসলো, তারপর মীনার মুখের দিকে চেয়ে বললো—কেমন যেন একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে।

—ক্লান্ত ! কই না তো ! মীনা সলজ্জ হেসে বললে।

—না তো মানে ! আমি দেখছি ক্লান্তি, আর তুমি বলছো—না ?

—কি জানি বাপু, ক্লান্তি আবার কোন্‌খানে দেখলে তুমি ! নাও, খেয়ে নাও !

কমলেশ আর কোন কথা বললো না। একটি একটি ক'রে টোস্ট, ডিম সেদ্ধ খেয়ে ফেললো এবং কফির পেয়ালাটি টেনে নিলো। মীনাও খাচ্ছিল কমলেশের সঙ্গে। অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটলো। আরও পরে মীনা বললো—

—আজ ফিরবে ক'টায় ?

—কেন ?

—এমনি জিজ্ঞাসা করছি।

—ধরো পাঁচটা।

—ধরলাম।

আবার চুপচাপ।

—আমার টাকাটা পাঠাতে কেন যে বাবা এত দেরী করছেন—বুঝতে পারছি না। দু'মাসের ওপর হয়ে গেল, কোন টাকাকড়ি বা চিঠিপত্র কিছুই নেই। কী হল ! মা বাবাই বা কেমন আছেন—তাও জানিনা। যাই হোক —যদি টাকা কড়ি কিছু আসে—নিয়ে নেবোতো ?

—সে আর বলতে ! বললো কমলেশ। —টাকা এলে নিশ্চয় সই ক'রে নেবে। দেখতে পাচ্ছো না--কি রকম কষ্ট যাচ্ছে ! টাকা চাই বই কি ! আমিও দেখছি, আজ কিছু পাবার কথা আছে। এই বলে সে উঠে শোবার ঘরের দিকে চলে গেল।

আরও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল মীনা। টাকার অভাব কি আবার মানুষের হয় নাকি ? টাকাতো ঘাসের মত বিছানো আছে এই পৃথিবীতে। মায়ের কাছে টাকা, বাবার কাছে টাকা, চাকর বাকরের কাছে টাকা, আলমারীতে টাকা, তাকে টাকা, বিছানায় টাকা, বালিশের তলায় টাকা— সর্বত্র টাকা ছড়ানো। নেবেই বা তুমি কতো, আর খরচই বা তুমি করবে কতো ?

একদিন···সকালে···বেলা দশটা বেজে গেছে, মায়ের কাছে একটা পয়সা চায়নি মীনা, কী কাণ্ডই না বেধেছিল সেদিন বাড়ীতে। বাবা জিজ্ঞাসা করেন—কি হয়েছে? মা জিজ্ঞাসা করেন কি হয়েছে? ছোট বোন অবধি প্রশ্ন করে—কি হয়েছে দিদি? কি দিনই গেছে। নির্ভর করা ভালো, সে নির্ভর মানুষের ওপরই হোক, আর ভগবানের ওপরই হোক। জ্ঞান বৃক্ষের ফল খেয়ে সোনার পৃথিবীতে দুঃখ কষ্টকে মানুষ নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছে।

মীনা পাহাড়ের দেশের মেয়ে। পাহাড়ীয়া জাতির সঙ্গে তার পরিচয় আছে। ওদের জীবন যাত্রা দেখলে হিংসে হয় মীনার। সব ব্যাপারগুলোকে কত সহজ ক'রে নিয়েছে ওরা। এমনি যদি হয়ে যেতো সমস্ত পৃথিবীটা। গোটা পৃথিবীর মানুষগুলো যদি এইভাবে হাসতে পারতো জীবনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে, তাহ'লে বোধহয়,—বোধহয় ভালোই হতো। তাতে পৃথিবীগ্রহের অধিবাসীবৃন্দ সভ্যতা লাভ করতো কিনা জানি না, কিন্তু শান্তি লাভ করতো। তা'ছাড়া—সময় সময় একলা একলা বসে ভাবে মীনা।—সভ্যতা মানে কি? কি সভ্যতার মাপকাঠি? এ্যাটম বম্ব্? কিন্তু মানুষের মনে ক্রমাগত এই যে মারণ-মন্ত্র-চিন্তার অগ্রগতি—একি সভ্যতা, না অসভ্যতা? কে বলে দেবে? মৃত্যুযন্ত্রের নাম সভ্যতা, না জীবন-মন্ত্রের নাম সভ্যতা? কে জানে!

জগত শুদ্ধ মানুষ জাতি যদি একজাতি হতো, ছোট ছোট গণ্ডী টেনে মাটি ভাগ ক'রে ক'রে যদি দেশ বিভাগের দ্বারা মাটি আর মানুষের বিভিন্ন নাম না দেওয়া হতো—সহস্র বন্ধনে যদি নারীকে না জড়ানো হতো তাহ'লে কি যে ভাল হতো তা বলবার নয়। মানুষের প্রেম পেতো ডানা' চরণ পেতো গতি·· মন পেতো মুক্তি।

কমলেশ এসে দাঁড়ালো দরজার উপর। চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এলো মীনা। বললো—কি দেবো বলতো?

—গোটা পঁচিশ টাকা দাও।

তৎক্ষণাৎ মীনা পাশের ঘরে চলে গেল। আলমারী খোলার শব্দ শোনা গেল, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মীনা বেরিয়ে এসে পঁচিশটা টাকা দিলো কমলেশের হাতে।

—আর পাঁচ টাকা রইল কিন্তু। বললো মীনা।

—মোটে!

—তাইতো থাকবে! মীনা বললো।

—কী উপায় হবে গো? ধরো, আমি যদি নাই পাই! মানে, পাওয়ার কথা আছে। কিন্তু কোন কারণে যদি না পাই?

—খাবো না আমরা।

—সে কি?

—হ্যাঁ, খাবো না। উপোস ক'রে দু'জনে শুয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেবো।

—আরে! ঘুমোবো তো জানি। কিন্তু খাবোটা কী?

ধীরপদে মীনা এগিয়ে এসে কমলেশের মুখে ছোট ক'রে একটু চুমু খেলো। বললো—

দিস্ সর্ট অব ভিটামিন ফুড! ডোন্‌চ্ ইউ লাইক ইট?

এর পরে তো আর বলার কিছুই থাকে না। ফিরে মীনার মাথাটাকে নিজের বুকের সঙ্গে টেনে নিয়ে একটুখানি চেপে ধরে ছেড়ে দিল কমলেশ। তারপর বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। দরজার উপর দাঁড়িয়ে রইল মীনা। থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে সর্ব দেহ মন। স্পর্শের মধ্যে এত মধু, এত মাদকতা? জগতের যত কাব্য, যত গান, মধুরের যত মাধুকরী—সবইতো এই স্পর্শটুকু নিয়ে! এই "একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি," তাতেই মুকুলিত হয়ে ওঠে নারীসত্তার নতুন শিহরণ।...এইটুকুর জন্যে মীনা, আজ সব হারিয়ে কমলেশের করুণার ভিখারিণী।

ঘরে টাকা থাকলে আজ কিছুতেই বেরোতে দিতাম না। কিছুতেই না। প্রেমের নীড়ে এই টাকা বস্তুটাই অশ্লীল। অনধিকার প্রবেশ করেছে টাকা দম্পতীর জীবনে। আর বাবাই বা কেন পাঠাচ্ছেন না, তাওতো বোঝা যাচ্ছে না। দূর ছাই! এই দেখ! খাবার কথাটা বলে দিতে ভুল হয়ে গেল তো! দুপুর বেলায় কোন একটা ভাল রেস্তোরাঁয় ঢুকে যদি একটা লাঞ্চ খেয়ে নেয়, তাহ'লেই ভাল। নইলে বিকেলে বাড়ী ফিরে আর কথা বলতে পারবে না।

ঘরের মধ্যে ফিরে এসে বিছানায় বসলো মীনা। বালিশের তলায় লুকানো কমলেশের প্রথম কবিতার বই 'শিউলি'। এটা মীনাই পয়সা খরচ ক'রে ছাপিয়েছে। কে জানে বিক্রী হচ্ছে কিনা। কাগজে কাগজে সমালোচনা তো খুব ভাল বেরিয়েছিল। যাক্‌গে! বিক্রী হোক বা না হোক, তাতে কিছুই যায় আসে না। এ কবিতা তার। এই বই তার নামেই উৎসর্গ করা।

শিউলী যাহার অঙ্গ গন্ধে
শিউলী যাহার মনে
ঝরা শেফালীর কবিতার মালা
তাহার সংগোপনে

ভাল লাগেনা এই লোকটা বাড়ীতে না থাকলে! লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো বিছানার উপর মীনা। বংশীধর অনেকক্ষণ থেকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। মেম সাহেবকে শুয়ে পড়তে দেখে প্রমাদ গণলো সে। এরকম দুর্ঘটনা এ সংসারে অনেকবার ঘটেছে। কতদিন দুপুরে রান্নাই হয়নি মোটে। সাহেব আর মেমসাহেব দু'জনে মিলে একটা বই খুলে খালি পদ্য ব'লে দিনটা কাটিয়ে দিয়েছে। সে এক মজার ব্যাপার। এ একবার পদ্য বলে, আবার ও একবার পদ্য বলে। সমস্ত দিন এইভাবে কাটিয়ে খাওয়া হল সেই রাত্রি বেলায়। আজও কি সেই রকম ব্যবস্থাই নাকি?

বংশীধরকে দেখে মাথা উঁচু ক'রে বললো মীনা—কী খবর বংশীদা?

—বলছি, আজ দুপুরে কি খাওয়া দাওয়া হবে না?

—কেন হবে না? রান্না ক'রে ফ্যালোগে!

—আপনি?

—আমি যা খেয়েছি, প্রচুর। আর দরকার হবে না।

—আপনি না খেলে, আমরাই বা খাই কি ক'রে?

—তাতে কোন দোষ নেই, তাতে কিছু দোষ নেই। ঘরে ডিম আছে, আলু আছে—ডিমের কারী ক'রে নাওগে, আর ভাত। কেমন?

—যে আজ্ঞে।

বংশীধর চলে গেল। চুপ ক'রে কড়ি কাঠের দিকে চেয়ে বিছানায় পড়ে রইল মীনা। হঠাৎ এক সময় কবিতার বইটি খুললো, প্রথমেই চোখে পড়লো—

নরের মাথায় শ্রমের পসরা
নারীর তনুতে কামনা—
প্রেম বলে 'চলো অমরার পানে'—
প্রয়োজন বলে 'নামোনা।'

এই সেই সর্বনাশা কবিতাটা। যেটা পড়ে ও যেচে কমলেশের সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিল। অনুদি অনেক বারণ করেছিল। বলেছিল দুটো লাইন দিয়ে একটা গোটা মানুষকে বিচার করিস্‌নে মীনু। কোথাও হয়তো ভুলচুক থেকে যাবে। তখন মরবি কেঁদে কেঁদে।

এখন অবধিতো কাঁদবার কোন্‌ কারণ ঘটেনি। এখন অবধি তো জীবন আনন্দময়, দিন প্রেমোচ্ছল আর রাত পুলক রভসায়িত! ওই দুটো লাইন কী ভয়ঙ্কর দোলা দিয়েছিল তাকে।

আজও মনে পড়ে।

সেদিন ঘন বর্ষার রাত্রি। হস্টেলে শুয়ে শুয়ে "সুদক্ষিণা" নামে একটি কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছিল মীনা। হঠাৎ চোখে পড়লো এই দুটো লাইনের কবিতা। লিখেছেন কমলেশ রায়। পড়ে পাগল হয়ে উঠলো মীনা। কি যেন একটা অসম্পূর্ণ কথা, একটা গভীর ইঙ্গিত আছে ওই লাইন দুটির মধ্যে—সারা রাত্রি লেগে গেল জেগে থেকে তা বুঝতে।

ভোরে উঠে মীনা গেল অনুদির ঘরে। অনুদি তখনো বিছনা থেকে ওঠেনি, কিন্তু চোখ খুলেই শুয়েছিল। মীনাকে দেখে বললে—

—'প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিনু দিন যাবে আজ ভাল।'

—কিন্তু আমার দিন যে খুব খারাপ যেতে বসলো অনুদি?

—এক রাত্রের মধ্যে এই নাটকীয় পরিবর্তনের হেতু?

—এই পড়েই ত্যাখোনা।

এই বলে কাগজখানি এগিয়ে দিয়ে ফাঁসির আসামীর মতো অপেক্ষা করতে

লাগলো মীনা। নিঃশব্দে লাইন দু'টি পড়লো অনুরাধা। আবার পড়লো··· আবার পড়লো। সব শেষ ছোট্ট ক'রে বললো।

—বেশ লেখা।

—মাত্র বেশ! ভরসা পেয়ে মীনা বলে উঠলো। খুব চমৎকার বলো!

—না। অতটা ইমোশনাল হবার মতো লেখা নয়। তবে বেশ লেখা। তা—কি?

—আমি এঁর সঙ্গে আলাপ করতে চাই।

—পাগল নাকি?

—পাগল কেন?

—নয়তো কী? কবে কোন কাগজে এ্যাক্সিডেণ্টলী দু'টো ভাল লাইন বেরিয়েছে, অমনি দৌড়ে যেতে হবে তার সাথে আলাপ করতে,—তাহ'লে তো আর বাঁচা যায় না।

—কেন? বাঁচা যায় না কেন? মীনার কণ্ঠে আহত অভিমান। ভাল লেখকের সঙ্গে আলাপ করতে চাওয়াটা কি পাগলামী?

—কবির সঙ্গে যদি আলাপ করতে চাস্ তো দু'কোটি দশ লক্ষ কবি বাংলা দেশে আছেন—তাঁদের কাছে যা।

—তাঁরা এই লেখা লিখতে পারেন না।

—না! তাঁরা পারবেন কেন? পারে শুধু তোর কমলেশ রায়। যা যা ঘরে যা। এ লোকটা আরো লিখুক—তারপর। এখন কি?

কোন কথা না বলে ম্লানমুখে মীনা চলে গেল নিজের ঘরে। মনে মনে বললো—আমি যেন এখনো ছোটই আছি। যা বোঝাবে, আমি তাই বুঝবো। এই কবিতার প্যারালাল্ নেই পৃথিবীতে। "নরের মাথায় শ্রমের পসরা নারীর তনুতে কামনা, প্রেম বলে চলো অমরার পানে—প্রয়োজন বলে নামোনা!" আহা! এই কবিতা নাকি বেশ লেখা! অনুদিটা এমন কিপ্টে। প্রাণ খুলে সুখ্যাতি করবে—তার মধ্যেও কৃপণতা? তা বলুক, অনুদি যা ইচ্ছে বলুক একে আমি চিঠি দেবোই।

সুদক্ষিণা কাগজের ভাদ্র সংখ্যা বেরোল। প্রথম পাতায় আছে কমলেশ রায়ের কবিতা। নতুন ক'রে মীনার মনে আবার মত্ততার ঢেউ এসে লাগলো—

রবি আর বারি যেমন করিয়া
বরষা রচনা করে—
নর আর নারী তেমনি করিয়া
সন্তান আনে ঘরে।

যে রাত্রে নিজের একলা ঘরে বসে মীনা কবি কমলেশকে চিঠি লিখলো, সে রাত্রিটা ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। জানলা দিয়ে দেখা যায় সুনীল আকাশের এখানে ওখানে উজ্জ্বল তারার প্রক্ষেপ। অনন্ত কালের মহা রহস্যের প্রতীক ওরা। বোধহয় কৃষ্ণপক্ষ ছিল, কেননা আকাশে চাঁদ ছিল না। ঈষৎ গোলাপী লেটার হেডে সবুজ কালিতে লিখলো মীনা—সবিনয় নিবেদন—

আমি সুদক্ষিণার গ্রাহিকা এবং আপনার রচনার অনুরাগিনী। প্রতি সংখ্যায় মাত্র চারটি লাইনের রেশনে আমার ক্ষিদে মিটছেনা। ক্ষুধার্তা ভক্তের আবেদনে আপনার আসন টলবে কি?

ইতি মি (ME)

পরের সংখ্যায় সুদক্ষিণা—কমলেশের অনেক বড় একটি লেখা বুকে নিয়ে বাজারে বেরুলো। যেমন সে লেখার চিন্তাধারা, তেমনি তার গভীরতা, তেমনি তার বলশালীতা। মীনার মনে হতে লাগলো কবি যেন এই লেখার দ্বারা তার কাছে আরও প্রত্যক্ষ, আরও নিকটবর্তী হয়েছে। তবু সে আবার চিঠি লিখলো—সবিনয় নিবেদন—

ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন বলে অনেক নমস্কার। জানি একাগ্র কামনা কোনদিন অপূর্ণ থাকে না। তাই সুদক্ষিণার মাধ্যমে চাই আরো আরো—আরো কাব্য, আরও কথা, আরও গান। আমি ছাত্রী, আমার পক্ষে এই কাব্যময়তা ভাল নয়, তবু কি জানি কেন, ভাল লাগে আপনাকে। ইতি

—মীনা—

মীনার চিঠির নির্দেশে কাগজ সুদক্ষিণা তার আকৃতি আর প্রকৃতি বদলাচ্ছে, এই গোপন খবরটুকু অনুরাধা জানতো না। সে জানতে পারলো সেদিন, যেদিন মীনার নামে একখানা মুখ ছেঁড়া রঙীন খাম হাতে ক'রে সে লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘর থেকে গম্ভীর মুখে বেরিয়ে এল।

নিজের ঘরে না গিয়ে সে সোজা গিয়ে উঠলো মীনার ঘরে। সেই ঘরে থাকে দু'টি মাত্র মেয়ে, দুটিই থার্ড ইয়ারের ছাত্রী, মীনা আর আরতি। অনুরাধা মীনার ঘরে ঢুকতে গিয়েই শুনলো—মীনা উচ্চকণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করছে—

দক্ষিণ সমুদ্র পারে
বাজায় কে অশ্রুধারে
অনন্তকালের এক অন্তহীন বীণা—
তাহারি ঝংকার লেগে
চিত্ত লোকে ক্ষিপ্রবেগে
জাগে মর্ত্য নিবাসিনী মূর্তীহীন মীনা।

এটাও কি সুদক্ষিণাতেই বেরিয়েছে? ভয়ানক গম্ভীর অনুদির স্বর।

খুব একটা মধুর অন্যায় যেন হঠাৎ ধরা পড়ে গেছে এমনি ভাবে চমকে উঠেছিল মীনা। একটু সামলে নিযে বললো :—

—হ্যাঁ। এমাসে বেরিয়েছে।

—ব্যাপারটা এতদূর এগোল কী ক'রে?

চুপ ক'রে রইল মীনা। অনুদির ব্যক্তিত্বের কাছে সে চিরকালই নিজেকে ছোট মনে করে। বিশেষ ক'রে কমলেশের ব্যাপারে তো বটেই। তাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে জলে উঠলো অনুরাধা—

—তোমার এই চিঠিখানি এসেছিল। লেডি সুপার-এর ঘর থেকে আমি এই মাত্র নিয়ে আসছি। এই নাও। এই বলে চিঠিখানি মীনার বিছানার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গট্ গট্ ক'রে অনুরাধা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মীনা একটি কথা বললো না, বা একবার ডাকলোও না তাকে। আজ যেন একটু অপমান বোধ করলো সে।

সবটাতেই অনুদির বাড়াবাড়ি। মনে মনে জলতে লাগলো মীনা। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু আলাপ করবার চেষ্টা করেছি, কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল তাতে? মানুষই তো মানুষের সঙ্গে আলাপ ক'রে? না গরুতে করে? আশ্চর্য! অমন ঝাঁজ দেখিয়ে যাবার কী অর্থ বোঝা গেলনা।

পাশেই চিঠিখানা পড়েছিল, তুলে নিল মীনা। ফিকে গোলাপী রংয়ের ঈষৎ গোলাপ-গন্ধী কাগজে টকটকে লাল রংয়ে লেখা চিঠি। ধড়াস্ ক'রে উঠলো মীনার বুকের মধ্যে। এতো কমলেশ বাবুর চিঠি! কি আশ্চর্য! এও কি সম্ভব? কমলেশবাবু কী ক'রে তার ঠিকানা জানতে পারলেন?

চিঠিটা না পড়ে মীনা চুপ ক'রে বসে ভাবতে লাগলো—কবে সে নিজের অজান্তে চিঠির মধ্যে ঠিকানা দিয়ে ফেলেছে। অবশ্য একথা ঠিক, আজকাল মীনা খুব বেশী চিঠি কমলেশকে লিখছে, কিন্তু তার কোন জবাবইতো চিঠিতে আসে না? আসে, সুদক্ষিণার মারফতে কবিতায়।

তাহ'লে লেডি সুপার-এর কাণেও উঠলো ব্যাপারটা। অনুদি যা হিংসুটে, হয়তো কত কী বলেছে তার নামে? হয়তো একথাও বলেছে যে প্রথম দিন কমলেশের কবিতা পড়ে কী ভাবে তার কাছে দৌড়ে গিয়েছিল সে! হয়তো—

আবার চিঠিটার দিকে চোখ পড়লো মীনার। হাতের লেখাটাতো বিশেষ ভাল নয়। বড় টানা টানা লেখা। তাহোক। নিজেই মনকে সান্ত্বনা দিলো মীনা। পুরুষ মানুষের লেখা পুরুষালী হওয়া উচিত—একটু বিশ্রী, একটু বাঁকা চোরা, একটু এলোমেলো না হলে সাবধানী মনের ছাপ থেকে যায়।

আবার চিঠিটার দিকে চাইলো মীনা। আস্তে আস্তে পড়তে লাগলো। ওমা! এযে কবিতা!

প্রিয়-প্রদক্ষিণ পথে
ঘূর্ণ্যমান পৃথিবী আর আমি।
নাম-না-জানা অন্ধ দুর্নিবার আকর্ষণ...
সৃষ্টির আদি থেকে দৃষ্টির আদিকাল পর্যন্ত।
ভ্রূণস্থ মানবকের মতো আমাকে
অপেক্ষার অন্ধকার জঠরে

রেখোনা হে সুদক্ষিণা···
উদয়-দিগন্ত আলো ক'রে আবির্ভুতা হও
ধরা-ছোঁয়ার সীমায়।
শতাব্দীর ক্লান্ত মানুষ আমি
এ্যাটম্‌বমের ধোঁয়ার ধূসর
আনো তোমার শিউলী-গন্ধী শরৎ প্রভাত

চিঠির গায়ের শিউলী-গন্ধ থেকে এটা অনুমান ক'রে নেওয়া হয়েছে। দুষ্টু কোথাকার! আবার পড়তে লাগলো মীনা।

আনো শনিবারের সাতটায় মনুমেণ্টের নীচে—
তোমার কায়িক উপস্থিতি···
তৃপ্ত হোক প্রতীক্ষিতের পথ চাওয়া।

দুর্‌ দুর্‌ করতে লাগলো মীনার বুকের মধ্যে। এ যে দেখা করতে বলছে গো! হ্যাঁ, এইতো বলছে আসছে শনিবাব সন্ধ্যা ৭টায় মনুমেণ্টের নীচে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে। মানুষটাতো বড় বস্তুতান্ত্রিক। শিউলী আর গোলাপে যে মিতালী পাতিয়েছিল কাগজে কাগজে, তা বুঝি সহ্য হচ্ছেনা আর? এবার চাই বুঝি ধরা ছোঁয়ার সীমায়? আচ্ছা লোভী তো?

কিন্তু শনিবারের সন্ধ্যায় যদি সে গিয়ে দেখে—এক হাতে ক্লাচ নিয়ে এক পা কাটা একটি তোতলা মানুষ তার জন্য অপেক্ষা করছে—তাহ'লে? কিম্বা যদি একটা পাথরের চোখ বসানো একটি কদাকার লোমশ বেঁটে জোয়ান দাঁড়িয়ে আছে তার দেখা পাবে বলে—এঃ! মাগো!

শনিবার মানে তো পরশু! দেখা করাটা কি ঠিক? খুব উচিত কাজ হবে কি? সে এখনো ছাত্রী, এখনো বাকী এক বছর বি-এ পাশ করতে। এর আগে এই মানস-বিলাসকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হবে কি? বাবা শুনলে কী বলবেন? মা শুনলে কী বলবেন? তাছাড়া আরো একটি ছেলে এই কলকাতার বুকে তার বাপ-মায়ের সানন্দ সম্মতি লাভ ক'রে তার পরীক্ষা পাশের দিন গুণছে —সেই বা কী ভাববে? সেতো প্রশান্ত ধৈর্যে অপেক্ষা ক'রে আছে তাকে

কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীরূপে বরণ করতে। সেই অবশ্যম্ভাবীতাকে ব্যর্থ করা তার উচিত কী?

কিন্তু অনুদি রাগ করেছে, ভীষণ রাগ করেছে। আস্তে আস্তে সে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে অনুদির ঘরে গেল। দেখলো—সে চুপ ক'রে নিজের বিছানার উপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে। মীনাকে দেখেই সে বলে উঠলো—

—কেন তুই আমায় বলিসনি যে কমলেশের সঙ্গে তুই হরদম্ চিঠিপত্র চালাচ্ছিস? কেন বলিস্‌নি? লেডি সুপার আজ নাহক্ কড়া কথা শোনালেন।

—কী বললেন? ভয়ে ভয়ে বললো মীনা।

—যা বলবার তাই বললেন। কাকাবাবুকে বোধহয় এ নিয়ে চিঠি লিখবেন উনি।

—সর্বনাশ!

—সর্বনাশ কেন? আমার মনে হয় রাইটলি সার্ভড্।

—না না অনুদি। কিন্তু এটা কি টি-পটে ঝড় তোলা হচ্ছে না? শোন, আমি সেজন্যে আসিনি। তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে এলাম।

—কোনদিন তো এমন অন্যায় কাজ করোনা। আজ হঠাৎ—?

—জীবন মরণ প্রশ্ন বলে। শোন। আসছে শনিবার সন্ধ্যা সাতটার সময় কমলেশবাবু মনুমেন্টের তলায় আমাকে দেখা করতে লিখেছেন। যাব? চুপ ক'রে থেকোনা অনুদি। বলো, যাবো?

—প্রাণ চায় চক্ষু না চায়, মরি একি তোর দুস্তর লজ্জা!

—না না অনুদি ঠাট্টা কোরো না, ঠিক ক'রে বলো!

—একি প্রেম? না এ্যাডমিরেশন। না হিরো-ওয়ারশিপ?

—মীনা চুপ ক'রে রইল। একমুহূর্ত তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে অনুরাধা হাসলো। তারপর স্বরে একটু বিদ্রূপ মিশিয়ে বললো—

—মেয়েদের ভালবাসা ব্যাপারটাকে এত সস্তা ক'রে দিলি কেন বলতো মীনা? কোথায় গেল তোর শিক্ষা দীক্ষা সম্ভ্রম আভিজাত্য? কোথায় গেল বাপ মায়ের তোকে ঘিরে স্বপ্ন দেখা? তাছাড়া সুমোহনবাবু নিঃশব্দে অপেক্ষা

করছেন তোর বি-এ পাশ করার জন্ম ? তিনি তোর বাপ মায়ের নির্বাচিত পাত্র—তিনিই বা কি ভাববেন ?

—বিয়ে আমি করবো না। অভিমানাহত মুখে বললো মীনা।

—তা করবি কেন ? নব-চণ্ডীদাসের প্রেমের আস্বাদ পেয়েছিস যে! হতভাগী ! এটা কেন তোর একবারও মনে হচ্ছে না, যে তোর এই দেখাশোনার ব্যাপার নিয়ে যদি শহরের কোন একটা কাগজে একটি মাত্র লাইনও বেরোয়, তাহ'লে কাকাবাবু সুইসাইড্ করবেন ! কী ? উত্তর দিচ্ছিস না কেন ? এই বলে নিজের মনেই একটু হেসে বললো অনুরাধা,—অবিশ্যি আমি জানি, আমাকে জিগ্যেস করা মানে তোর একেবারে বুড়ী ছোঁওয়া। ছি ছি ছি, এই ভাবে মানুষ ডোবে কখনো ? যা ইচ্ছে কর্‌গে যা। আমার সামনে আর কক্ষণো আসিস্‌নে।

ধীরপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মীনা।

অনিদ্রা···উৎকণ্ঠা...উল্লাস আর আশঙ্কার মধ্য দিয়ে এলো শনিবার। মনের মধ্যে যে গান বাজে—বুকের হৃদ্‌পিণ্ড ভয়ে ভয়ে তার তাল দেয়। বেলা ছুটো থেকে পাঁচটা বাজলো একখানা শাড়ী বাছতে; আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যখন মীনা নিবিড় ক'রে, নিটোল ক'রে, আপন দেহ বল্লরীকে অপরূপ ক'রে তুলছে, সেই সময় পিছন দিয়ে চুপি চুপি এসে দাঁড়ালো অনুরাধা। জল ছল-ছল চোখে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখলো অভিসারিকার তনু-তোষামোদ। ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস পড়লো,—ব্যথা-ভারাক্রান্ত মুখে সে সরে গেল দরজার উপর থেকে। নিয়তিকে বাধা দেবার, প্রকৃতিকে বাধ্য করার শক্তি মানুষের হাতে নেই। সমুদ্র-পাগলিনী স্রোতস্বিনীর বুকে বালির বাঁধ দিয়ে পথরোধ করার চেষ্টা ক'রে লাভ কি ? সেই নিঃসীম লবণাম্বুতে আত্ম-নিমজ্জন তার প্রাক্তন।

টপ্ টপ্ ক'রে অনুরাধার চোখ দিয়ে ছু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। তবু—তবু অভিমান ক'রে দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখলে চলবে না। দূরে থাকলেও ওর কাছেই থাকতে হবে। শুধু তাই নয়,—অনুরাধা ঠিক জানে আজকে এদের এই পরিচয় দপ্ ক'রে দাবানলের মতো জ্বলে উঠে ছু'জনের কামনাকেই লেলিহান

ক'রে তুলবে, কাজেই……। আচ্ছা, সুমোহন বাবুকে খবরটা কি দেওয়া উচিত? কিংবা গৌহাটিতে কাকাবাবুকে…?

ছ'টা বাজতে না বাজতে ঝলমল ক'রে উঠলো মীনার সার্বাঙ্গিক রূপ। একেই তো বিধাতার উচ্চ শ্রেণীর শিল্প রচনার নিদর্শন তার রূপ, তার ওপর সযত্ন প্রসাধনে সে সৌন্দর্য যেন ক্ষুরধার হয়ে উঠলো। হস্টেলের আর সব মেয়েদের দু'চারজন – যারা দৈবক্রমে মীনার ঘরের সামনে দিয়ে যাতায়াত করছিল—তারা অত্যন্ত অবাক হয়ে গেল। এতো প্রসাধন নয়—এযে রণ-সজ্জা! প্রতিপক্ষকে চোখের পলকে ভূমিসাৎ করাব অব্যর্থ—অমোঘ কৌশল আজ যেন ওর হাতের মুঠোয়।

দুর্ দুর্ করছে বুকেব মধ্যে। গলাটা বারে বারে শুকিয়ে যাচ্ছে—আর এক গ্লাস জল খেয়ে নিলে ভালো হতো। সমস্ত মেয়েরা যেন আড় চোখে তার দিকে চেয়ে গোপনে হাসাহাসি করছে। করুক্‌গে। কোন প্রতিবাদ, কোন বাধা, কোন সমালোচনা তাকে এই সংকল্প থেকে টলাতে পারবে না।

কমলেশকে তার ভাল লেগেছে। তার মধ্যে সে খুঁজে পেয়েছে তার কবিকে, — তার দয়িতকে, তার পুরুষকে। কমলেশ জিনিয়াস। জিনিয়াসদের চেনা খুব মুস্কিল,—কথায কথায় লোকে তাদের ভুল বোঝে,—এ ভুল মীনা করবে না,—সে ভুল বুঝবে না কমলেশকে।

—এই ট্যাক্সি!

মুহূর্ত মধ্যে ট্যাক্সিওযালা গাড়ী ঘুরিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে বাঁ হাত দিয়ে দরজা খুলে দিলো। উঠতে গিয়ে আঁচলটা আটকে গেল দরজায়—জোরে ছাড়াতে গিয়ে হয়তো কাপড়টা একটু ছিঁড়েই গেল বা! যাক্‌গে! চমক ভাঙলো মীনার—যখন দেখলো ট্যাক্সিওয়ালা তার দিকে একদৃষ্টে চেয়েই আছে। ও! গন্তব্য বলা দরকার যে! চৌরঙ্গী! আস্তে আস্তে বললো মীনা।

অনেকটা এগিয়ে আসা গেছে। ভাবলো মীনা। অবশ্য এখনো হস্টেলে ফিরে যাওয়া যায়। একটা হুকুমের অপেক্ষা। কিন্তু ফিরে যাবে বলে তো সে

[illegible] যাচ্ছে না। ফিরে সে যাবে না। নাঃ, কিছুতেই ফিরে যাবে না সে। মনে মনে সে আবৃত্তি করতে লাগলো—

"নরের মাথায় শ্রমের পসরা, নারীর তনুতে কামনা। প্রেম বলে চলো অমরার পানে, প্রয়োজন বলে—নামো না।" এ যার লেখা, এই অনুভূতি যার, এত বেদনা যার বুকে—সে কখনো খারাপ লোক হতে পারে! তোমরা বললেই আমি শুনবো?

বৈকালিক ময়দান—

লোকে লোকারণ্য। ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে মনুমেণ্টের দিকে এগোলো মীনা। সবাই চাইছে কেন এমন ক'রে তার দিকে? না, তাকে চেনে এরা! মনুমেণ্টের উত্তর পশ্চিম গা ঘেঁষে সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছে খদ্দর পরা একটি লোক। কিছু লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। লম্বা ছিপছিপে গড়নের মানুষ। গলার আওয়াজের মধ্যে মধু আছে, কিন্তু মোহ নেই। এদিক ওদিক চাইলো মীনা। কই, কোথায় কমলেশবাবু? হাত ঘড়িটা দেখলো ঠিক সাতটা। এক মিনিট বেশী হয়নি এখনো—ওই যে স্যুটপরা লোকটি হাসিমুখে এগিয়ে আসছে—ওই ঠিক কমলেশ। আশ্চর্য সুন্দর দেখতে তো! ওমা! ওযে চলে গেল! তাহ'লে? ভয় ভয় করতে লাগলো মীনার। এর সবটাই ধাপ্পা, সবটাই মজা দেখা নয়তো? বক্তৃতা-রত মানুষটির দিকে আবার চাইলো মীনা। সে রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে আবার আরম্ভ করলো—

"এর নাম সাম্যবাদ। সমাজের প্রতি স্তরে যখন এই সমতা বিরাজ করবে, যখন ধনীর পোলাও আর দরিদ্রের পান্তা একই মর্য্যাদায় বিরাজ করবে, যখন নতুন মডেলের গাড়ীর চাকার কাদা গরীবের গায়ে না লেগে শ্রমিকের কাদা পায়ের দাগ ধনিকের স্যুটে আঁকা হবে—সেদিন আসবে সাম্যবাদ। মার্কস্ বলেছেন—"

আস্তে আস্তে বসে পড়লো মীনা, মনুমেণ্টের একটা সিঁড়িতে। সাড়ে সাতটা অবধি না দেখে ফিরে যাওয়াটা ঠিক হবে না। এখন ৭টা বেজে ৫ মিনিট। দেখা যাক্।

সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা

একটা বড় রাস্তার মোড়ে এসে কমলেশ ট্যাক্সিটাকে থামতে বললো। বিস্মিত ট্যাক্সি চালক গাড়ীটাকে ফুটপাথের গা ঘেঁষে দাঁড় করালো। তারপর বিনয় নম্রকণ্ঠে কারণ জিজ্ঞাসা করলো। বিরক্তি মেশানো গলায় কমলেশ বললো—ইয়ে গাড়ী মেরা পসন্দ নেই হোতা। আওয়াজ কাঁহাসে নিকল্‌তা হ্যায় ?

সর্দারজী বিনীত ভঙ্গীতে বললো ইঞ্জিনের একটা 'নাট্' একটু ঢিলে আছে, সেই জন্যে। ছোড়ো, ছোড়ো, হাম একঠো নয়া ট্যাক্সি বোলায়গা। এই বলে কমলেশ গাড়ী থেকে নেমে পড়ে ভাড়া চুকিয়ে দিল। নীরবে ম্লান মুখে সেলাম ক'রে ড্রাইভার ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেল।

দু' মিনিট দাঁড়াতেই আর একখানি নতুন গাড়ী পেয়ে গেল কমলেশ। গাড়ীতে চেপে বললো—ড্যালহৌসী।....গাড়ীর মধ্যে কমলেশের বসার ভঙ্গী দেখে মনে হয় কোন একটি লক্ষপতির ছেলে যাচ্ছে বুঝি। পোষাকে পরিচ্ছদে কথায় বার্তায় চালে চলনে সে একেবারে যাকে বলে সর্বাধুনিক। বাঁ হাতের মুঠোয় সর্বদাই ধরা থাকে 'তিন-পাঁচ' ওয়ালা সিগারেটের টিন, পকেটে থাকে একটি সুদৃশ্য সিগারেট লাইটার। না, জীবনের বিরুদ্ধে তার কোন নালিশ নেই।

গাড়ীটা তখন সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউ থেকে বৌবাজারে বেঁকছে, হঠাৎ ফুটপাথের দিকে চেয়ে চোখের পলকে নিজের মাথাটা ড্রাইভারের সিটের পিছনের নীচে নামিয়ে নিলো কমলেশ। কী সর্বনাশ ! দোস্ত্ মহম্মদ কাবলীওলা ব্যাটা কিনা এখানেও দাঁড়িয়ে আছে ! ভয়ে দুর্ দুর্ ক'রে উঠেছিল কমলেশের হৃদ্‌পিণ্ড। যদি ও দেখতে পেতো, তাহ'লেই হয়েছিল আর কি ! আগেতো চেপে ধরতো তোমার জামার কলার, তারপর তুমি ওকে যা বোঝাবার তা বোঝাতে। গুরু গম্ভীর কণ্ঠে—"হাম আছ্‌লী নেই মাংতা, চুদ লাও !" যে একবার শুনেছে সেই

মজেছে। স্থান নেই অস্থান নেই, মান নেই সম্মান নেই, দুঃখ নেই, দুর্ভোগ নেই, যেখানে তোমাকে পাবে, সেইখানেই চেপে ধরবে তোমার জামার কলার।
…মীনাটা যদি সেই সময় জীবনে আসতো তাহ'লে আর এই কেলেংকারীটা ঘটতো না।…কিন্তু সে সময়তো কেউ ছিল না। ছিল শুধু একদিকে উপবাসক্লিষ্ট…

দোস্ত্ মহম্মদ তাহ'লে ড্যালহৌসী পাড়ায় এসে পৌঁছেচে! আর কোন উপায় নেই। যতই সাবধান হওয়া যাক, কমলেশের অফিস সে খুঁজে বার করবেই করবে, এবং লাঞ্ছনার প্রাপ্তি যোগও অবশ্যম্ভাবী। নাঃ! ভাবিয়ে তুললে লোকটা। দোস্ত্ মহম্মদকে সে বৌবাজারে ঢুকতে দেখেছে, ভুল হবার নয়। সে ঠিক তারই অফিসে যাচ্ছে। অতএব, অফিস বর্জন আজ। অন্য কাজ করা যাবে।

ড্রাইভারকে অর্ডার দিলো কমলেশ—এসপ্ল্যানেড যেতে। হাত ঘড়িতে দেখলো ১১টা বেজে দু-এক মিনিট হয়েছে। নিজের একখানা গাড়ী না হলে আর চলছে না কিছুতে। প্রেস্টিজের কথা বাদ দিলেও—কম্‌ফর্টের কথাটা অমীমাংসিতই রয়ে যায়। ছোট্ট একখানা টু-সীটার কেনবার কথা বলেওছিল মীনা। কিন্তু আজ চার পাঁচ মাস ওর বাপের কাছ থেকে কোন টাকা কড়ি বা চিঠিপত্র না আসায়, বেশ একটু অসুবিধের সৃষ্টি হয়েছে। যাই হোক—হবে ঠিকই। হ্যাঁ, হবে।

নিজের মনেই হাসলো কমলেশ! মাঝে মাঝে ভগবান বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে। নইলে তার বরাতে এই কোহিনূর মণি জুটলো কী ক'রে? রাজার শয্যাসঙ্গিনী হবার কথা যার, সে কিনা তার বাহুতে মাথা রেখে ঘুমোয়? দুনিয়াতে আর আশ্চর্য কী হতে পারে? এই তো পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য!

—রোখো! রোখো! বলে উঠলো কমলেশ। মেট্রোর বিপরীতে ঘুরিয়ে রাখলো ট্যাক্সি বৃদ্ধ শিখ সর্দার। গাড়ী থেকে নেমে ব্যাগটি হাতে নিয়ে কমলেশ রাস্তা পার হতেই দক্ষিণ দিক থেকে ডাক এলো—

—হ্যাল্লো! হ্যাল্লো! ঘণ্টে যে! কী ব্যাপার?

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কমলেশ সেই দিকে চেয়ে দেখতে পেলো তার বাল্যবন্ধু সুখেন সরকার। সুখেন বড় লোকের ছেলে, নিজে এটর্নী, সুপুরুষ। বরাবরই সে কমলেশকে একটু করুণার চোখে দেখে গরীব বলে।

—ব্যাগ ফ্যাগ নিয়ে কোথায় চলেছিস ঘণ্টে?

—এই বেরিয়েছি ভাই একটু কাজে। তারপর, খবর সব ভালতো? এই বলে কমলেশ পাশ কাটাবার চেষ্টা করতেই সুখেন তার হাত ধরলো।

—আয় একটু কফি খাওয়া যাক।

—না না—একটু কাজও আছে। তাছাড়া—

—মাই গুড্‌নেস! তুই আবার কাজের মানুষ কবে থেকে হ'লিরে? আয়, আয়, এক পেয়ালা ক'রে কফি খেয়ে নেওয়া যাক! ভয় নেইরে, ভয় নেই—পয়সাটা আমিই দেব! বাবা! কী হ'লি রে তুই?

অগত্যা কমলেশকে ঢুকতেই হল কাফেতে। দু'জনে বসবার পর সুখেন সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললো—

—তারপর? ভোল্ ফিরিয়ে ফেলেছিস্। ব্যাপার কী? এনি কাপ্তেন কট্?

—না-না। আমার স্ত্রীর—

—স্ত্রীর! সেকিরে!

—হাঁ স্ত্রীর! গলায় জোর দিয়ে বললো কমলেশ।

—আবার বিয়ে করলি নাকি তুই?

এই প্রশ্নে সচকিত হয়ে এদিক ওদিক চাইল কমলেশ। কী জানি! জগতে শত্রু পক্ষের তো কোন অভাব নেই। ফট্ ক'রে গিয়ে যদি কথাটা কাণে তুলে দেয়, তাহ'লেই হয়েছে। কিন্তু এই সুখেনটাতো ভয়ানক জ্বালালো! কোত্থেকে যে আপদগুলো এসে জোটে তার ঠিক নেই। বেরিয়েছি একটা ভাল কাজে, যত সব উড়ো ঝন্‌ঝাট!

—বিয়ে মানে—গলাটা নামিয়ে বললো কমলেশ। —এ ডিস্‌টিংগুইশড্ লেডি—এখন সেখানেই আছি—মানে কমরেড আর কি!

—বুঝেছি, বুঝেছি। হো হো ক'রে হেসে উঠল সুখেন। —তুমি বাবা ঘোড়েল ছেলে। বেকার বসে থাকার বান্দা তুমি নও। বেশ, বেশ, ভাল শিকার। হ'ল কতদিন?

—প্রায় এক বছর। বললো কমলেশ!

—বাঃ ! স্থায়ীত্বও তো বেশ ভাল দেখছি ! বয়েস কতো ?

—তুই বড় বাজে বকিস্ সুখেন। আমি কি একটা বুড়ির সঙ্গে বসবাস করছি নাকি ? বয়েস হবে বছর উনিশ কুড়ি।

—লাভ্‌লি ! কফিতে চুমুক দিয়ে চোখ দুটোকে আধবোঁজা ক'রে সুখেন উচ্চারণ করলো। একটু চুপচাপ। ঠিক ওদের পেছন দিকেই মৃদু গুঞ্জনে একটি তরুণ আর তরুণী আলাপ করছে—তারই ধ্বনি ভেসে আসছে। তরুণীটি বললো :

—না না বিজুদা। খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। তাছাড়া ট্যাক্সিতে ডায়মণ্ড হারবার—এক গাদা টাকা খরচ ক'রে—

—ডোণ্ট বি এ ফুল ! তোমার চাইতে আমার টাকা বড় নয়।

কফির পাত্র থেকে মুখ তুলে সুখেন দেখলো কমলেশ এক দৃষ্টে তরুণীর দিকে চেয়ে আছে। তার মুখে চোখে ফুটে উঠেছে কামনার আরক্তাভা। —বেশ আছে এরা। কাজ নেই, কর্ম নেই, একটির পর একটি নারী নিয়ে দিন কাটছে। মেয়েদের মুঠোর মধ্যে আনতেও যেমন দেরী হয়না এদের, তেমনি বিলম্ব হয়না তাদের দিক থেকে মুখ ফেরাতে। আশ্চর্য !

—কফিটা তোর জল হয়ে গেল যে !

—হ্যাঁ। এই যে খাই। অপ্রস্তুত হয়ে বললো কমলেশ। বুঝলো—ওই তরুণীর দিকে চেয়ে থাকাটা সুখেন দেখে ফেলেছে। তাই একটু অপ্রতিভ ভাবে বললো নীচু গলায় : মনে হচ্ছিল, ওই মেয়েটিকে আমি চিনি। তাই বোঝবার চেষ্টা করছিলাম।

—কফিটা খেতে খেতেই চেষ্টাটা কর ভাই ! তারপর ? তোর সেই ট্যাংরা-না-মর্মাহাটা বলে একখানা কাগজ ছিল, সেটা আছে এখনো ?

—সুদক্ষিণা। অভিমান ভরে বললে কমলেশ। —কোন একটা খবর যদি রাখিস্ ! আশ্চর্য ! —না, সে কাগজখানা নেই। মানে—

—বুঝেছি, বুঝেছি। তা' লেখা টেখাও কি ছেড়ে দিয়েছিস ? না—

—না। লিখছি এখনও, তবে—

—সে ভিগারটা নেই, বুঝেছি। তা' তোমার পুরাতনীর কী ব্যবস্থা করলে, শাবকগুলি সমেত ?

—দে আর হ্যাপি ! বালীগঞ্জে প্রকাণ্ড বাড়ী কিনে দিয়েছি, মাসে পাঁচশো ক'রে টাকা পাঠাচ্ছি—

—খুব ভাল, খুব ভাল। কিন্তু এই টাকাকড়ির সোর্স কোথায় ?

—সোর্স আবার কোথায় হবে ? এবার যিনি এসেছেন, তাঁর পিতা ধনী। মাসে দু'হাজার ক'রে এখন পাঠাচ্ছেন, এরপরে হয়তো তাঁর দার্জিলিং-এর প্যালেসেই গিয়ে থাকতে হবে। বাইশটা চা বাগান, সহজ কথা কি ? এই বলে এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে কমলেশ বললো, তুই একদিন আমার ওখানে আয়না সুখেন ! বিশাল ঐশ্বর্যের মাঝখানে একা একা দু'জনে বাস করি। তোরা এলেতো বেঁচে যাই ! এই বলে একটা ঠিকানা বললো।

—সেকি ! ওবাড়ীটা টিপারা স্টেটের ছিল না ?

—ওয়াজ্। আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটে উঠলো কমলেশের মুখে।—পাস্ট টেন্স্। বড়লোকদের খবরতো রাখিস্না ? আজ আমি বুঝছি সব ফাঁকা, সব ফাঁকি। ওই যে বাড়ী গাড়ী আর তক্‌মা—বিলকুল্ সুগার কোটিং। 'এই বলে আবার গলাটাকে নামিয়ে বললো—লাস্ট নভেম্বরে আমার শ্বশুর মশায় মহারাজা সিকিমকে পঁচিশ লাখ টাকা ধার দিয়েছেন। সে ডীড্ আমার কাছে। ভালকথা, তুই ওল্ড কোর্টেই বসছিস্তো ?

—হ্যাঁ। সুখেনের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে যেন।

—এর মধ্যে যাবো একদিন। ওই দলিলটা একবার দেখে দিস্তো ভাই। কী জানি, কোথায় কোন আইনের প্যাঁচ আছে —হয়তো শেষকালে কিছুই পাবোনা। শ্বশুর মশায় যা মানুষ। একেবারে পুরো মহাদেব। এতগুলো টাকা ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষেতো সম্ভব নয়। ···আচ্ছা আমি উঠিরে !

—কোথায় যাবি ?

—যাবো—এই অবধি বলে কমলেশ সুখেনের মুখের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু

হাসতে লাগলো। তারপর বললে, তোকে বলতে অবশ্য 'বাধা নেই। যাবো—নেপাল এসেছেন এখানে, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

—তা' ট্যাক্সি ক'রে কেন? বাড়ীর গাড়ী নেই?

তু'খানা। একখানা গিন্নী নিয়ে গেলেন গান্ধীঘাটে। স্পটটা নাকি অদ্ভুত লাগে, আর একখানার ড্রাইভার শুয়েছেন ফ্লু-তে। ফলে—। তাছাড়া, তুইতো—এসব জানিসনে। তোরা বড়লোক হলেও এই সব অভিজাত কাণ্ডকারখানা তোদের জানা নেই। ট্যাক্সি ক'রে ঘোরাটা আজকাল—ফ্যাশান।

—ফ্যাশান!

—হ্যাঁ। এই বলে কমলেশ উঠে দাঁড়াল! তারপর জামাটা হাত দিয়ে ঠিক করতে গিয়ে যেন চমকে উঠলো।—এইরে! কেলেংকারী করেছি!

—কী হল?

—পার্স'টা গাড়ীতেই ফেলে এসেছি।

—সে কিবে। কত ছিল?

—সেটা ভয়ানক কিছু না, সামান্যই। এ ফাইভ-এইচ্ অব সামথিং লাইক দ্যাট্। এই বলে কিছুকাল রাস্তাব চলমান যানবাহনের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো কমলেশ। তাবপর নিজের মনেই কী বললো, ঘড়িটা দেখলো (সুখেন দেখলো অত্যন্ত দামী ঘড়ি) তাবপর চট্ ক'রে সুখেনেব দিকে চেয়ে বললো—

—সঙ্গে টাকা আছে?

—আছে, কিন্তু খুচরোতো নেই ভাই। ছি ছি অতগুলো টাকা তুই গাড়ীতে ফেলে এলি কোন আক্কেলে!

—এর জন্যে প্রায় রোজই আমাকে ঠাট্টা সহ্য কবতে হয় ভাই। এইতো, পরশু না কবে—একটা নতুন ব্যাগ শুদ্ধ বেশ কিছু টাকা—মেট্রোতে আমার পাশের চেয়ারে রেখে চলে এসেছি। ও আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। ও আর লাগেনা। দ্যাখ্-দ্যাখ্—কী আছে তোর ব্যাগে!

ধুরন্ধর এ্যাটর্ণী, কঞ্জুষ আইনজীবি-সুখেন এই কথা শুনে তার ব্যাগটা খুলে ধরলো। দেখা গেল, চারখানা একশো টাকার নোট রয়েছে। টাকাটার ওপর

হাত দিয়ে কমলেশ মনে মনে কী যেন হিসেব করতে লাগলো। তারপর দু'খানা নোট তুলে নিয়ে বললো—

—দু'খানা নিলাম। তুই যদি সন্ধ্যের পর একবার বেড়াতে বেড়াতে যাস ভাই দয়া ক'রে আমার ওখানে। যাবি? রথ-অর্থাৎ আমার প্রিয়াকেও দেখা হবে, আর কলা বেচা—অর্থাৎ এই টাকাটাও নিয়ে আসা হবে। যাবি?

—দেখি!

—দেখি নয়। বল্ আমাকে। তাহ'লে আমি তোকে রাত্রে আমার ওখানে ডিনারের নিমন্ত্রণটাও ক'রে রাখি।

—আচ্ছা! কিন্তু তুই এভাবে একা একা বেরোস্‌নে। যা ভুলো মন। কোনো দিন হয়তো একটা মোটা রকম হারিয়ে—

—না না। সঙ্গে আমার পি-এস থাকে। কিন্তু আজকের এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট তাকে ছেড়ে দেবার পর হয়েছে। ন্যাচারালি—আয়!

ফুটপাথে নেমে কমলেশ বললো—অফিস যাবিতো?

—হ্যাঁ।

—চল্ তোকে একটা লিফ্‌ট্ দিই।·· তোদের একখানা গাড়ী ছিলনারে?

—হ্যাঁ। আছে তো!

—সেই ভাঙা ঝরঝরে ফোর্ড্—

—হ্যা।

—পুয়োর সোল! কাঁধদুটো ঝাঁকিয়ে হেসে উঠলো কমলেশ। —ট্যাক্সিতে উঠে কমলেশ বললো—একটু আধটু যোগাযোগ রাখিস্ আমার সঙ্গে বুঝলি? আর কিছু না পারি—কোলকাতার মনুমেণ্টাল মানুষ ক'টাকেতো তোর মক্কেল ক'রে দিতে পারবো?

—আরে আমি কি জানি ছাই যে তুই এই কাণ্ড ক'রে বসে আছিস! তা' হলেতো নিশ্চয়ই—

—বেটার লেট্ দ্যান নেভার। উঁ? আবার সেই বৈলাতিক হাসি।

গাড়ী থেকে নেমে সুখেন—আচ্ছা ভাই ঘণ্টে, বলতেই কমলেশ বললো—নো

ঘণ্টে ইন্ মাই প্যালেস প্রিজ। উঁ ? মনে থাকবেতো ? এখনকার নাম হচ্ছে—মলয়। কেমন ? সন্ধ্যের পর আয়তো ! মিসেস কে দেখলে বুঝবি যে, আগেকার *আনারকলি, মমতাজ আর হেলেন গল্প কথা নয়।* সো লং ! হুস্ ক'রে ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সুখেনের মুখে একটি মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো। মনে মনে ভাবলো—সত্যিই মানুষের ভাগ্য নিয়ে কোন আলোচনা বা অনুমান করা ঠিক নয়। এই ঘণ্টে, কী ছিল, আর কী হয়েছে। চাকবী নেই, বাকরী নেই, দু'টি ছেলে আর স্ত্রীর হাত ধরে একদিন বাড়ীতে এসে হাজির। সন্ধ্যাকাল। কী ব্যাপার ? না, কাল থেকে সপরিবারে উপোস ক'রে আছি। খেতে দে। তারপরই আমরা সবাই মিলে চাঁদা তুলে পাঁচশো টাকা দিই কাগজ বার করবার জন্যে।

সেই ঘণ্টে....। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম··· ?

কিন্তু ট্যাক্সিতো অনন্তকাল চলতে পাবে না। গাড়ীর মধ্যে চোখ বুঁজেই ভাবলো কমলেশ। কোন একটা জায়গায় বসা দরকাব। কিন্তু তার আগে একটা লাঞ্চ খেয়ে নিলে হতো। অফিসে যাওয়া আজ হতে পারে না, যেহেতু দোস্ত্ মহম্মদকে দেখা গেছে ওপথে। আব দোস্ত্‌কে যে পথে দেখা যায়, সে পথ দুর্গম। সেদিকে যেতে নেই, গেলে সমূহ সর্বনাশের সম্ভাবনা।

যাইহোক, উপার্জনটা খুব খারাপ হ'লনা। বাড়ী থেকে বেরিয়েই দুশো টাকা। মন্দ কী ? নট্ ব্যাড্। কিছু খেয়ে নিয়ে আবার বেরোনো যাবে, তারপর বাড়ী ফেরা যাবে বেলা ৪টের চায়েব ঠিক আগে। সহরের দ্বন্দ্বমুখর প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দাম জটাজালের জটিল বন্ধন থেকে, নিভৃত গৃহকোণেব প্রতীক্ষা-রতা প্রেয়সীর সন্নিকটবর্তীতা—অনেক বেশী আরামের, আনন্দের, আশ্বস্তির।

"জীবনটা গোলমেলে হয়ে গেছে।" মাঝে মাঝে ভাবে কমলেশ। গোড়া থেকে যদি এটাকে সরল সহজ পথে চালানো যেতো, তাহ'লে এত ভাবনা, এত

চিন্তা, এত কৌশল এ সব কিছুই প্রয়োগ করতে হতো না। কিন্তু গতস্য শোচনা নাস্তি। এক ভুল থেকে পা তুলে আর এক ভুলে পা দিয়েছে কমলেশ। এখন আর কোন উপায় নেই। এই ভাবেই চলবে। একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলেই একেবারে সর্বনাশ।

এই সব ভাবতে ভাবতে 'ফারপোতে' ঢুকে একটা লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে বসলো কমলেশ। এইভাবে যদি প্রতিদিন দুশো ক'রে ঘরে আসে, তাহ'লে মাসে হয় ছ'হাজার। খুব মন্দ নয়! তবে মুস্কিল হচ্ছে এই যে, সব সময় বোকা লোক চোখের সামনে আসে না। তাইতেই—। যাই হোক। টাকা এখন তার রোজগার না করলেও চলে। কেননা যে পরিমাণ টাকা খরচ করে মীনা, তাতে তাদের দু'জনের কেন, আরও পাঁচজনের থাকা খাওয়া বেশ ভাল ভাবেই চলে যায়! কিন্তু বৃদ্ধ বাঘ আর বেকার পুরুষ এক জাতের। সে কমলেশ পারবে না, তাকে কেটে ফেললেও না।

—কমলেশবাবু নাকি? নমস্কার!

মুখ ফিরিয়ে কমলেশ দেখলো, একটি গোঁফওয়ালা প্রৌঢ় ভদ্রলোক নিঃশব্দে তার পাশে এসে বসলো। কমলেশ প্রথমটা চিনতে পারেনি, পরে বুঝলো ইনি সুদক্ষিণার কাগজ সরবরাহ করতেন। অত্যন্ত রূঢ়ভাষী ব্যবসায়ী, পয়সা আদায়ের জন্য বাপের খাতির করেন না। নাম জগমোহন সরকার। এতকথা মনে হওয়া সত্ত্বেও কমলেশ না চেনার ভাণ ক'রে ড্যাব ড্যাব ক'রে চেয়ে রইল। জোর করে টেনে আনা বিরক্তির চিহ্ন মুখে।

—কাকে চাই? বললো কমলেশ।

—আপনাকেই। পালিয়ে গিয়ে কি এ জগতে পার পাবার উপায় আছে মশায়? আম্যার হকের টাকা। এই বলে একটু থেমে আবার বললো—ভোল্ তো বেশ ফিরিয়েছেন দেখছি। স্যুট্ ফুট্ বাগিয়ে, হাতঘড়ি ফাতঘড়ি লাগিয়ে—বহুত্ আচ্ছা। তা অবস্থা যখন ফিরেছে, তখন গরীবের টাকা কটা কি দেবেন দয়া ক'রে এবার?

—কিসের টাকা? গলায় একটু অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বললো কমলেশ।

—খুব যে! উত্তর এল তার চেয়েও জোরে। ওসব বদিয়তি ছেড়ে বাপের সুপুত্তুর হয়ে টাকা কটা ছাড়ুন দিকি! নইলে গলায় গামছা দিয়ে টাকা আদায় করবো আমি! আমার নাম জগমোহন সরকার। বুঝেছ?

ইতিমধ্যেই হলের লোকজন সব তাদের দিকে চাইতে সুরু করেছে! আর খানিকক্ষণ এই ভাবে চললে ওরা হয়তো ভীড় ক'রে দাঁড়াবে চার পাশে। খুবই চটে গেল কমলেশ। ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত ক'রে বললো—

—কত টাকা বাকী তোমার?

—তাও এর মধ্যে ভুলে মেরে দিয়েছ? উনচল্লিশ টাকা পাঁচ আনা তিন পাই। দু'মাসের কাগজের দাম।

—ও!

নিজের ব্যাগটা খুলে এক এক ক'রে নিঃশব্দে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, লয়েডস্ ব্যাঙ্ক, হং কং সাংহাই ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক, ইত্যাদি প্রায় কুড়িটি বিখ্যাত ব্যাঙ্কের চেকবই টেবিলের উপর রাখলো কমলেশ। তারপর গম্ভীর গলায় বললো—

—কোন্ ব্যাঙ্কের চাই, বলো?

জগমোহন এতটা আশা করেনি! সে চিরকাল কমলেশকে জানে গরীব ছাপোষা সাহিত্যিক। এটা আনেতো ওটা কুলোয়না। কাগজে কাগজে গল্প লিখে, পদ্য লিখে নিজের সংসার চালায়! সেই মানুষ হঠাৎ এল ফারপোতে লাঞ্চ খেতে, পরনে তার অত্যন্ত দামী স্যুট, ব্যাগের মধ্যে কুড়িটা ব্যাঙ্কের চেকবই! জগমোহনের চোখের সামনে যেন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের খেল্ সুরু হয়ে গেল! তবু সে কষ্টে ঢোঁক গিলে নরম গলায় বললো—চেক দিয়ে কি ধুয়ে জল খাবো? আমাকে ক্যাশ টাকা দিন মশায়।

—তোমার জন্য ক্যাশ টাকা কি আমি বুকে করে নিয়ে বেড়াব? টাকা পাবে, টাকা নিয়ে যাও। এনি ব্যাঙ্ক ইউ চুজ্! ক্যাশ নিয়ে কোন ভদ্রলোক আজকাল পথে বেরোয়না। লর্ড কার্জনের সময় ওটা চালু ছিল। বলো, বলো কোন ব্যাঙ্ক?

জীবনে এমন সংকটে পড়েনি জগমোহন। সে ভাবতে লাগলো, ক্রমাগত ভাবতে লাগলো। বেয়ারা এল খাবার নিয়ে। সেদিকে চেয়ে ধমক দিয়ে উঠলো কমলেশ।—তোমার ওই অশ্লীল চেহারাটা নিয়ে একটু তাড়াতাড়ি সরো দিকিনি! এই বলে সে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের চেক-বইটা তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে টাকার জায়গাটায় লিখতে লাগলো—চল্লিশ টাকা।

—উঁহু! উঁহু! চল্লিশ নয়। উনচল্লিশ টাকা, পাঁচ আনা তিন পাই যে!

—কিছু যায় আসে না তাতে। করুণার হাসি হেসে বললো কমলেশ।—আজ আমার যা অবস্থা, তাতে শুধু উনচল্লিশ কেন, উনচল্লিশ হাজার নিলেও আমি টের পাবো না। বুঝেছ জগমোহন সরকার!

—বলেন কি মশায়! বিড় বিড় ক'রে বললো জগমোহন।—এবারকার রেঞ্জার্স টা মারলেন বুঝি?

—চিরকালের রেঞ্জার্স মেরে দিয়েছি। এই বলে মৃদু হেসে কমলেশ নাম লিখতে লাগলো।

—না-না ক্রস করবেন না ক্রস করবে—কিন্তু ততক্ষণে চেকটি ক্রসড্ হয়ে গেল। পাতাখানি ছিঁড়ে জগমোহনের হাতে দিয়ে কমলেশ বললো—এবার পথ দ্যাখো বাবা। কাগজের বদলে কাগজতো পেলে! আর কেন?

ততক্ষণে কৃতজ্ঞতায় ও অনুশোচনায় বিগলিত হয়ে গেছে জগমোহন। আকর্ণবিস্তারী হাসি হেসে সে বললো—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার কাছে টাকা থাকা মানে—টাকা আমার ব্যাঙ্কে থাকা। তবে কি জানেন, ব্যবসাটা মন্দা পড়েছে, এদিকে বাকী বকেয়াও পড়েছে অনেক, ফলে মাথাটা কেমন ঠিক রাখতে পারিনে। যাই হোক, আপনি কিছু মনে করবেন না। তা' আবার কি কাগজ বার করছেন স্যার?

—উঁ? এ্যাপিটাইট ডোজে চুমুক দিয়ে বললো কমলেশ।—কাগজ? কী জানি, কাগজ হয়তো বার করতে হবে, নয়তো হবেনা। হ'লে অবিশ্যি তোমার কাছ থেকেই কাগজ আসবে—সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

—হেঁ হেঁ-হেঁ-হেঁ,—সে আমি জানি স্যার। আপনার মতো মানুষ হয় না।

তা স্যার মনে রাখবেন এই অধমকে। এই বলে দু' পা দরজার দিকে গিয়ে আবার ফিরে এলো জগমোহন। এখন আছেন কোথায় স্যার ?

—আছি ? এই বলে যেন নিজের মনেই হেসে উঠলো কমলেশ। তোমার কি মনে হয় জগমোহন—যে, আমি এখনও সেই কালীঘাটের পতিত পাত্র লেনের তেরোর-বারোর সেই এঁদো পচা বাড়ীটাতেই আছি ?

—না-না। তবে স্যার, খদ্দের আমার আপনি। পাঁচ জনকে বলতেও তো আমার ভাল লাগে! তাই ঠিকানাটা—

—হায়দরাবাদের নিজামের বাড়ীটা চেনতো ?

—নিজাম-এর ? আজ্ঞে না তো!

—সে কি হে ? লাভ্‌লক্ প্লেসে অত বড় তিন বিঘে জমি জুড়ে বাড়ী! সেই বাড়ীটা এই নরাধম কিনেছে।

শরীর খারাপ করছে জগমোহনের। আর কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে সে সন্ন্যাস রোগে মারা যাবে। গল্প শুনেছে বটে কে একজন মুড়ি চিঁড়ে বিক্রী ক'রে কোটিপতি হয়েছে,—আর এক জন যেন কে খবরের কাগজের হকারী করতে করতে পরে বাংলা দেশের এক জন মন্ত্রী হন। কিন্তু তাই বলে সুদক্ষিণা কাগজের কমলেশও তাই হবে নাকি ? কী করলো তবে জগমোহন—এতকাল কাগজ বিক্রী করে ?

—আচ্ছা। তাহ'লে আসি স্যার। এই বলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল জগমোহন সরকার, পেপার মার্চেন্ট।

যত সব উড়ো ঝন্‌ঝাট। পথ থেকে ফলো ক'রে ঢুকে পড়েছে। চিলের মতো সব অপেক্ষা করছে—ছোঁ মারবে বলে। আশ্চর্য! পৃথিবীটা ভদ্রলোকের বাসোপযোগী কবে হবে ? সুস্বাদু খাদ্যাবলীর ভিড়ের মাঝে হারিয়ে গেল কমলেশের চিত্ত।

বেলা ১টা থেকে ২টো

ঘরে একটা ভ্রমর ঢুকেছে……

গুণ গুণ গুণ গুণ ক'রে সে এ জানালায় ও জানলায় মাথা খুঁড়ছে। কী চায় কে জানে! কিছু চাইছে ঠিকই। মধু লোভী প্রণয়ী। ফুলের রং বিচার করে না—ঢং বিচার করে না, জাতি না, ধর্ম না,—শুধু মধু পেলেই হল। যে ফুল ওকে মধুর সঞ্চয় উজাড় ক'রে দিতে পারবে না, তার দিকে ও ফিরেই চাইবে না।

বিছানায় চিত্ হয়ে শুয়ে শুয়ে এ সব কথা ভাবছিল মীনা। মনে মনে ভাবলো তার কমলেশ যদি এই ভ্রমর জাতীয় মানুষ হতো, যদি প্রণয়ের 'প্র'ও না থাকতো তার মধ্যে! যদি মীনার দেহটার ওপরই একমাত্র লক্ষ্য থাকতো কমলেশের, তাহ'লে কী হতো ?

কী আবার হতো ? স্যুইসাইড্ করতো মীনা। যতক্ষণ কাছে থাকেনা, ততক্ষণ যেন মনে হয় অনন্তকাল, কিন্তু কাছে থাকে যতটুকু সময়, সেটুকু 'ফুস্' ক'রে ফুরিয়ে যায় কেন ? কত কম পরমায়ু। হাতের ওপর মাথাটি রেখে একটি দুটি কথা বলেছ কি না বলেছ, অমনি পুবদিক ফর্সা হয়ে গেল! এত বলি যে,—তোমার কাজ করবার দরকার কি বাপু ? তবু শুনবে না। তবু রোজ একবার ক'রে ওর বেরোতেই হবে। কী যে রাজ কাজ করে ওই জানে!

নিজের মনেই মিষ্টি একটু হাসলো মীনা। দিন কী ভাবে কেটে যায়! হু হু ক'রে উড়ে যায়—ডানা মেলা পাখীর মতো।…অথচ দেখা হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কী কাঁপাই না কেঁপেছিল বুকটা!

—মা!

—কীরে ? মাথাটা তুলে বংশীকে জবাব দিলো মীনা।

—বেলা একটা বেজে গেল। রান্নাও হয়ে গেছে। কিছু খেয়ে নিলে পারতেন। বাবুতো আসবেন সেই যাকে বলে গিয়ে একেবারে বিকালে—।

—খিদে নেই বংশী।

আপনার মনে বিড়্ বিড়্ ক'রে বকতে বকতে বংশী চলে গেল। মীনা আবার টান হয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিল।....বেশ লাগছে ভাবতে, বেশ লাগছে। মধুর স্মৃতির রোমন্থন আর কি !

কী আশ্চর্য !

মনুমেণ্টের তলায় বক্তৃতারত লোকটিই শেষকালে এগিয়ে এল মীনার দিকে। তখন ৭টা বেজে ২৫ মিনিট। এক মুহূর্ত ইতঃস্তত ক'রে তিনি বললেন :—মাত্র পঁচিশ মিনিট বিলম্বকে খুব বেশী অ-ভারতীয় বলা কি চলে মীনা দেবী।

প্রথমটাতে মীনা কিছুই বুঝতে পারলো না—ব্যাপারটা কী! এই ভদ্রলোকতো ওইখানে দাঁড়িয়ে 'সাম্যবাদ' 'সাম্যবাদ' ক'রে চীৎকার করছিলেন, হঠাৎ এগিয়ে এসে তাকে সম্বোধন করছেন কেন ? সে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে বোকার মতো চেয়ে আছে দেখে ভদ্রলোক আবার বললেন—

—বাক্ বা শ্রবণে আপনার কোন গলদ আছে এমন কথা আমি শুনবোনা মীনা দেবী। মনকে প্রস্তুত করেছি অন্যভাবে—এখন বিপরীত কিছু দেখলে ভয়ঙ্কর আঘাত পাবো। আশা করি এতক্ষণে আমায় ঠিক চিনতে পেরেছেন এবং আপনার মনের মধ্যে আমাকে দেখে ইতিমধ্যেই অনুতাপ সুরু হয়েছে।

—না-না, কুণ্ঠিত ভঙ্গীতে বলবার চেষ্টা করলো মীনা।

—আমিই কমলেশ। বলে সে মীনার পাশে বসে পড়লো ধপ্ ক'রে।

হর্ষ-বিষাদের দোলায় দুলছে মীনার মন। এই কমলেশ ? এই অত্যন্ত সাধারণ-দর্শন ভদ্রলোক ? গায়ে খদ্দরের জামা, পরণে খদ্দরের ধুতি এবং পায়ে পাঁচসিকে দামের রবারের চটি ? ছিঃ ছিঃ। কিন্তু চেহারার মধ্যে যে একটা পৌরুষ আছে,—নাক আর চিবুকের গঠনের মধ্যে একটা অসাধারণ ব্যক্তিত্ব লুকিয়ে আছে,—সেটাও স্বীকার করা উচিত। মীনা মুখে বললো—

—আপনিই কমলেশবাবু ?

—না হলে যদি খুশী হন তবে এখনো আমার পিছিয়ে যাবার রাস্তা আছে। বলুন !

—না না।

—ধন্যবাদ। এই বলে কমলেশ যেন আরাম ক'রে বসলো। তারপর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বার ক'রে বললো—

—আপত্তি নেই তো এতে?

—না।

—অনেক ধন্যবাদ। অবশ্য ধোঁয়া জিনিসটা মেয়েরা পছন্দ করেন না, একথা সর্ব-জনবিদিত। তাঁরা স্পষ্টতার পক্ষপাতিনী।

—সবাই কি তাই? মীনা মনে মনে সহজ হবার চেষ্টা করছে। লোকটা ভয়ানক রসিকতো? প্রথম পরিচয়েই যে এমন রসিকতা করতে পারে দু'চার-দিন পরে সে তো কাঁধে হাত দিয়ে ইয়ারকি করবে?

যাই হোক, শক্ত হতে হবে মীনাকে। কোন ক্রমেই যেন তাকে এ লোকটা সুলভ বলে মনে না করে। কমলেশ সামনের দিকে চেয়ে সিগারেট টানছে, এই অবসরে ওকে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিলো মীনা। নাঃ! চেহারা যা ভাবা গিয়েছিল তার চাইতে অনেক ভাল। ঠোঁট দুটি পাৎলা এবং মুখের রেখাটি কমনীয়। দাঁতগুলি খুব সাজানো এবং ঝকৃঝকে। হাতের আঙুলগুলি কবি-জনোচিত লম্বা লম্বা এবং লতানো। মোট কথা—এক কথায় কমলেশ সম্বন্ধে তার পূর্ব্ব মত পরিবর্তন করলে খুব বেশী অন্যায় হবে না।

কমলেশ সিগারেট টানতে টানতে হঠাৎ ফিরে চাইল মীনার দিকে। বললো—প্রথম দর্শনের পক্ষে স্থানটা বেশ ভাল। কিন্তু প্রথম আলাপের পক্ষেও কি তাই?

—না। ফট্ ক'রে বলে বসলো মীনা। একটু একটু ক'রে ভাল লাগছে ভদ্রলোকের এই নৈর্ব্যক্তিক ভাবটা।

—না তো? তাহ'লে চলুন অন্য কোন একটা জায়গায় যাই। সন্ধ্যা হ'য়ে এল। এবার আলোতে চলুন। স্পষ্ট হোক পরস্পরের মুখের রেখা। এই বলে কমলেশ উঠে দাঁড়াল, এবং তৎক্ষণাৎ চলতে আরম্ভ করলো। মীনাও চললো পেছনে পেছনে। কেমন যেন ভয় ভয় করছে মীনার। এ রকম অপরিচিতের সঙ্গে মেলামেশা করা একেবারেই অভ্যেস নেই তার।... যদি কোন একটা চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়! যদি সুমোহন দেখতে পায়?

দু'জনে গিয়ে বসলো একটা রেস্তোঁরায়। 'বয়' এসে দাঁড়াতেই—কমলেশ মীনার দিকে চেয়ে বললো—অনেকক্ষণ বকেছি বক্ বক্ ক'রে, কাজেই আমি কিছু নিশ্চয় খাব। আপনি ?

—আপনি খান। আমার খিদে নেই।

—প্রথম পরিচয়েই খিদের পরিচয়টা দিতে চাননা তাহ'লে ?

কথাটার দুটো মানে। লাল হয়ে উঠলো মীনা। আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। আরও একটু পরে খাবার খেতে খেতে কমলেশ বললো—

—'সুদক্ষিণা' ঠিক ঠিক পাচ্ছেন তো ?

—হ্যাঁ।

—উন্নতি অবনতি সম্পর্কে কিছু বলবেন ?

—না।

—কাগজ সম্বন্ধে কিছুই বলার নেই ?

—আপনার লেখা আরও বেশী ক'রে দেবেন। চোখ দু'টি নীচু ক'রে বললো মীনা।

—সামান্য প্রার্থনা, কিন্তু আমার জীবনে আপনার আবির্ভাব—সত্যি সূর্যোদয়ের মতো। যা ছিল অন্ধকার যা কিছু ছিল অনিশ্চিত, সবই এক পরমাশ্চর্যের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আমার মতো একজন সামান্য কবিকে—মহিমান্বিত করেছেন আপনি।

—এমন ক'রে বলবেন না। কথা ফুটছে মীনার মুখে এবার। —আমি আপনার ভক্ত।

—অথবা আমি আপনার। উঃ ?

বলেই হো হো ক'রে হেসে উঠলো কমলেশ। তারপরে বললো—এ যেন সেই মুর্শিদাবাদ স্টেশনের নবাবজাদা আর আমীরজাদার গল্পের মতো শোনাচ্ছে—না ? জানেনতো গল্পটা ?

—না তো !

—দু'জন সম্ভ্রান্ত মুসলমান, দাঁড়িয়ে আছেন ট্রেণের প্রতীক্ষায়। দু'জনেই

আসবেন কোলকাতায়। গাড়ী এল। দরজা খুলে দিয়ে একজন আরজনকে বললেন—

—আপ্-আগাড়ি উঠিয়ে। আপ্ নবাবজাদা হ্যায়!

—হুহি, হুহি। আরজন বললেন—আপ্ আগাড়ি উঠিয়ে, আপ্ আমীরজাদা হ্যায়। এই ভাবে দু'জনে দু'জনকে ক্রমাগত খাতির করতে লাগলেন। অথচ গাড়ীতে ওঠেন না কেউ। ট্রেন ছেড়ে দিলো, তখনও সেই শূণ্য প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দু'জনে দু'জনকে হাত নেড়ে নেড়ে ক্রমাগত বলে চলেছেন—আপ্ নবাব-জাদা, আর আপ্ আমীরজাদা। ঠিক সেই রকম নাকি? আপনি বলছেন—আমি আপনার ভক্ত, আর আমি বলছি, নানা, আমি আপনার ভক্ত।

জোরেই হেসে উঠেছিল মীনা। কিন্তু তাতে একটা সুবিধে হলো। সহজ হ'য়ে গেল পরিবেশ। পরস্পর পরস্পরের দিকে চোখ চেয়ে কথা বলতে লাগলো। অনেক কথাই হ'ল সেদিন। সাহিত্যের, সঙ্গীতের, মাসিকপত্রের, ক্রিকেটের, ফুটবলের, সবশেষে প্রসঙ্গ উঠলো চায়ের। এই চায়ের কথা উঠতেই কল কল ক'রে কথা কইতে লাগলো মীনা। কেননা চা সম্বন্ধে কথা বলাটা তার বার্থ রাইট। সে বললো—

—বাড়ীতে আমরা যে চা খাই, সে রকম চা কিন্তু কোলকাতায় দেখতেই পাওয়া যায় না। এটাতো একটা নাম-করা রেস্তোঁরা, কিন্তু এই কি চা? বাড়ীতে —গরম জলে চা ছেড়ে দিলে পাড়াশুদ্ধ লোক টের পেলো যে অমুক বাড়ীতে চা হচ্ছে।....কোলকাতার সবই কেমন অদ্ভুত, সবই যেন ভেজাল।

—একমাত্র নারী হচ্ছে অকৃত্রিম কোলকাতায়।

—আ-হা! বলেই মীনা বুঝতে পারলো বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। সে একটু সামলে নিয়ে বললো—কিন্তু চায়ের মতো নারীকে তো খাওয়া যায়না,—তাই—

—কে বল্লে আপনাকে? আমার বক্তব্যকে মার্জনা করবেন। কিন্তু নারী হচ্ছে জগতের একটি উৎকৃষ্ট ভোজ্য। পাতে সকলেরই পড়ে, কিন্তু খেতে সকলে পারেনা, শুধু এ ক্ষেত্রে ভোক্তার ভয় থাকবেনা, বদ, হজমের ভয়।

কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন ক'রে মীনা লাল হয়ে উঠলো। লজ্জা

গেল বটে, কিন্তু ভালও লাগলো। মনে মনে ভাবলো সুন্দর কথা কন্ তো কমলেশবাবু। কোন জবাব না দিয়ে ঈষৎ হাসি মুখে সে চায়ে চুমুক দিতে লাগলো···

—এ কথা একবারও ভাবিনি যে আমার সামান্য লেখা কোন একটি অসামান্যাকে দোলা দেবে। এ আমার জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যা। কবিতা অনেকেই লেখে. কিন্তু পুরস্কৃত হয় ক'জন ?

এ কথারও উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করলোনা মীনা। কেননা এসব অর্ধ স্বগতোক্তির জবাব না দেওয়াই ভালো।

—একটা কথা, যদি অভয় দেনতো, বলি।

—বলুননা ! বললো মীনা।

—আপনার-আমার জীবন নদীর ধারা, যদি বা আজ মিললো, তা'কি এই আজকের দিনের প্রথম পরিচয়ের মরুভূমিতেই হারিয়ে যাবে ? একি আর কিছুদূর এগোবেনা ?

—কেন এগোবে না ! বলুন কী করতে হবে ?

—তাও কি আমিই বলবো ?

—নয় তো কি আমিই বলবো ?

—বলবেন না ?

—না। আমার লজ্জা করছে। মাথা নীচু ক'রেই বললো মীনা।

—সপ্তাহে একদিন ক'রে—অর্থাৎ শনিবারে শনিবারে যদি আমরা মিলবো বলি, তাহ'লে সেটা কি খুব বেশী চাওয়া হবে ?

—না। বেশ তো, তাই হবে।

—কৃতার্থ হলাম।

—এই ভাবে নানা অলস কথাবার্তার পর ওরা দু'জনেই উঠে দাঁড়াল। কমলেশ বললো—

—হস্টেলে ফিরবেন তো ?

—হ্যাঁ।

—আমি যদি আপনাকে এগিয়ে দিই, তাহ'লে সেটা আপনার পক্ষে উৎকণ্ঠার কারণ হবে না তো ?

—কেন ? হাসি মুখে বললো মীনা।

—না, অনেকে চান পরিচয়কে রেস্তোঁরাতেই রেখে যেতে। সেটাকে পথে ঘাটে বইতে অনেকেই নারাজ।

—কিন্তু আমি বওয়াটাকে খুব গৌরবের বলে মনে করি। আসুন।

দু'জনে বাইরে বেরিয়ে একখানা ট্যাক্সি করলো। একটু পরেই গাড়ী এসে দাঁড়াল হস্টেল থেকে একটু দূরে। নামবার মুখেই মীনার হাতটা চেপে ধরলো কমলেশ। সামান্য একটু চাপ দিয়ে চাপা স্বরে বললো—শনিবার।

—শনিবার। তেমনি চাপা আওয়াজ মীনারও।

—পাকা ?

—হ্যাঁ।

নেমে গেল মীনা। মিটার দেখে তিন টাকা দশ আনা দেবার জায়গায় ড্রাইভারকে দিলো একখানা দশ টাকার নোট। বললো—ইয়ে বাবুকো পঁহুছা দো ! কমলেশ যেন টাকা দেওয়ার ব্যাপারটা দেখতেই পেলো না। সে তখন সিগারেট ধরাতে ভয়ানক ব্যস্ত।

গুণ্ গুণ্ ক'রে গান বাজছে মীনার মন-বীণায়। শুক্তির মধ্যে মুক্তার আবির্ভাব ঘটছে। তাই তো আজকে স্বাতী নক্ষত্রের বুকে টলটল করছে জল। কবির সাহচর্য এত মধুর, এমন মাদকতাময় ? কেমন যেন একটা খুসীর ঝুমঝুমি বাজছে সর্বদেহে-মনে। সবাইকে যেন ভাল লাগছে আজ ; ইচ্ছে হচ্ছে সবাইকে ভালবাসতে। কলতলায় ঝি মানদা কথা কইছে—গান গাইছে নাকি ?

রাত্রি ৯টা বেজে কুড়ি মিনিট...

ঘরে ঢুকে মীনা দেখলো অরুদি তার বিছানায় বসে বসে বই পড়ছে। তাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বললো—হ'ল অভিসার পর্ব শেষ ?

—হ্যাঁঃ ! এই বলে হাসিমুখে জামা কাপড় না ছেড়েই বিছানায় গিয়ে গড়িয়ে

পড়লো। এক মুহূর্ত গম্ভীর মুখে তার দিকে চেয়ে থেকে বললো অনুরাধা—

—অতঃপর ?

—ইতি। শব্দ ক'রে ছোট্ট একটু হেসে মীনা পাশ ফিরলো…

পরের শনিবার…

তার পরের শনিবার…

তারও পরের শনিবার…

মীনার দূর সম্পর্কের এক মাসীমা থাকেন ব্যারাকপুরে। তাঁর বাড়ীতে যাবে বলে ভোর ৭টায় মীনা বেরোল হস্টেল থেকে। বড় রাস্তার ওপর একটু দূরেই ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড। সেখানে গিয়ে বেছে বেছে একখানা নতুন মডেলের ছোট গাড়ী ভাড়া করলো মীনা। গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে চালক বললো—কোথায় যাব বলুন।

—এগিয়ে চলুনতো! এখনো কিছু ঠিক নেই। তবে সমস্ত দিনই ঘুরতে হবে আপনাকে। হয়তো ফিরতে রাত্রি হবে। তেল বেশী নিয়েছেন কি ?

—না। নিয়ে নিচ্ছি। বিনাত:গলায় বললে গাড়ীর চালক। একটু পরেই একটা স্টেশন থেকে দশ গ্যালন তেল নিয়ে গাড়ী ছুটলো এস্‌প্লানেডের দিকে। মেট্রোর বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে ছিল কমলেশ। গাড়ীটা থামতেই উঠে বসে বললো—

—চার মিনিট লেট্‌।

—তেল নিতে হল, তাই—

—ও!

গাড়ীটা যখন মিউজিয়ামের কাছ বরাবর এসেছে, তখন সামনে ঝুঁকে পড়ে কমলেশ বললো—ডায়মণ্ড হারবার।

—ডায়মণ্ড হারবার ? ড্রাইভার বললো।

—হ্যাঁ।

ব্যস্‌। গাড়ী নিঃশব্দে ছুটে চললো গন্তব্যাভিমুখে। ছোট্ট ব্যাগটি খুলে ছোট্টতম আরসীটার মধ্যে নিজেকে একবার চট্‌ ক'রে দেখে নিল মীনা। হাল্কা গেরুয়া রঙের শাড়ীটি পরে আজ অপরূপ দেখাচ্ছে তাকে। দু'বার তার দিকে

চেয়ে দেখলো কমলেশ। দু'বারই কী যেন বলতে গিয়ে হাসি মুখে থেমে গেল। মীনা এটা লক্ষ্য করেছিল। তাই জিজ্ঞাসা করলো—

—আমাকে কিছু বলবেন বলে মনে হচ্ছে!

—হ্যাঁ। বল্‌ছি এ কী বেশ আজ আপনার? যুদ্ধের পূর্বেই প্রতিপক্ষ মারা পড়বে যে!

—আপনি এমন ফ্ল্যাটারী করতে পারেন!

—না না রিয়্যালি। আজ মোটে চাওয়াই যাচ্ছে না আপনার দিকে।

—আ-হা!

—হু হু ক'রে গাড়ী ছুটে চলেছে। দু'পাশে দিগন্ত বিথারী মাঠ—সদ্য ঘুম ভেঙ্গে উঠে রোদ্দুর পোয়াচ্ছে। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম। মাঠের শেষে এখনো কুয়াশার ঘোমটা টানা। একটু শীত শীত করছে। পৃথিবীর প্রসন্ন প্রভাত ভারী ভাল লাগছে মীনার। আজ যেন তার সবাইকে ডেকে বলতে ইচ্ছে করছে, ওগো তোমরা শোন—আমি ভালবেসেছি। তোমাদের এই মাঠে ঘাটের সূর্য্যোদয়ের মতো আমার মনেও প্রেমের সূর্য্যোদয় হয়েছে। আমাদেরও এখন প্রণয়ের প্রভাত কাল চলছে। তোমরা সবাই মিলে আশীর্বাদ করো যেন—আমাকে মধ্যাহ্নে দাবদাহে কষ্ট পেতে না হয়...এমনি যেন মধুর থাকে—আমাদের পরিবেশ।

—মাঝে মাঝে বাইরে আসা ভাল। বললো কমলেশ।

—কেন?

—সহরের ধুলো ধোঁওয়া থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

এ কথার কোন জবাব দিল না মীনা। তার মন তখন অনেক কথা ভাবছে। একেবারে বিপরীতধর্মী চিন্তা। সে ভাবছিল তাদের গৌহাটির বাড়ীর কথা। অনেকদিন বাবার চিঠি পায়নি—কি জানি অনুদি সব কথা বলে দিয়েছে না কি! তা'যদি কিছু লিখে থাকে অনুদি—তাহ'লে একেবারে জন্মের মতো বন্ধু বিচ্ছেদ। আর কথাই বলবেনা মীনা ওর সঙ্গে!

আশ্চর্য মেয়ে এই অনুদি। সেই যে প্রথম দিন কমলেশের সঙ্গে দেখা ক'রে সে ঘরে গিয়ে দেখেছিল অনুদি তার বিছানায় বসে বসে বই পড়চে, তাকে দেখে

বললো—অতঃপর ? ব্যস ! তারপর থেকে আর সে একটাও কথা কয়নি মীনার সঙ্গে। ভা-রী! কথা না কইলে তার বুঝি আর দিন চলেনা! বড় ব'য়েই গেল মীনার—অনুরাধা কথা না কইলে। যাক্‌গে ! মরুক্‌গে যাক্ ! উচ্ছন্নে যাক্ !

—কী খাবেন ?

একদম অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল মীনা। কমলেশের প্রশ্নে হঠাৎ চম্‌কে চাইল। তারপর বললো—কিছু বলছেন ?

—হ্যাঁ, বলছি কী খাবেন ?

—সেটা ওখানে গিয়েই ঠিক করা যাবে। আমি কিন্তু কখনো যাইনি—ডায়মণ্ড হারবারে। পাওয়া যায়তো সব কিছু ?

—হ্যাঁ, আমি যখন গিয়েছিলাম বছর চার পাঁচ আগে, তখন সবই পাওয়া যেত। অন্ততঃ মুর্গি আর ভাত তো পাওয়া যাবেই।

—খুব ভাল হবে।

গাড়ীটা চলছে একটা গ্রামের পাশ দিয়ে। পথের পাশে একটা ছোট্ট দোকানে একটি মেয়ে তেলেভাজা ভাজছে। কমলেশ গাড়ী থামিয়ে নেমে গিয়ে কিছু কিনে নিয়ে এল। তারপর বললো—

—খাবেন ? এগুলো কিন্তু গরম থেতে বেশ লাগে।

—একখানা।

—সবই গরম কিন্তু।

—জানি। কিন্তু একখানা।

এইভাবে একটা ফুলুরী, একটা পেঁয়াজী ও একখানা বেগুনী খেলো মীনা। একটু চা পেলে—

—পাওয়া যাবে নিশ্চয়।

—আশা করা যাক্।

চা-পাওয়া গেল। এরপরে আবার গাড়ী ছুটে চললো পূর্ণোদ্যমে। অনেকক্ষণ থেকেই মীনা অনুভব করছিল, থেকে থেকে যেন কমলেশ অন্যমনস্ক হ'য়ে

যাচ্ছে। কী যে ভাবছে সে, কে জানে! কিন্তু ভাবছে ঠিক, নইলে ডায়মণ্ড হারবার যত এগিয়ে আসছে, ততই পথের দিকে চেয়ে আছে কেন?

যাই হোক—যে কারণেই চেয়ে থাক এ ধরণের প্লেজার ট্রিপগুলো কিন্তু সত্যিই ভারী আনন্দের। তাছাড়া যাকে ভালবাসি; তার সঙ্গে যে কোন ট্রিপই আনন্দের। তবু—!

গাড়ী ডায়মণ্ড হারবার ঢুকলো এবং মিনিট তিনেকের মধ্যে মুখ ঘুরিয়ে ডাকবাংলোর কম্পাউণ্ডে এসে দাঁড়িয়ে গেল।

কমলেশ ড্রাইভারকে বললো—তুমি ইচ্ছে করলে গাড়ী এখানে রেখে খাওয়া দাওয়া সেরে আসতে পারো। কেননা আমাদের দেরী হবে, বেশ দেরী হবে।

—যে আজ্ঞে। বলে ড্রাইভার গাড়ী থেকে নেমে দরজাগুলো লক্ ক'রে দিয়ে চলে গেল। পাশেই কেয়ার-টেকারের বাড়ী। নাম তার সামাদ। বয়স হবে বছর ত্রিশ। বাড়ী থেকে বেরিয়ে সেলাম ক'রে দাঁড়ালো।

—কেমন আছো সামাদ? প্রশ্ন করলো কমলেশ।

—আপনাদের দয়াতে একরকম ভালই আছি হুজুর। অনেকদিন পরে এলেন হুজুর, ভাল আছেন তো?

—হ্যাঁ। কেটে যাচ্ছে কোন রকমে। ঘরটা খুলে দাও সামাদ। দৌড়ে গিয়ে চাবি দিয়ে সামাদ ঘর খুলে দিলো, তারপর ছোট্ট একটা ঝাড়ন নিয়ে এসে ঘরের টেবিল চেয়ারের ওপরকার ধূলোটা মুছে নিলো তাড়াতাড়ি। তারপর হাত যোড় ক'রে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো…

—চমৎকার ঘর! বললো মীনা।

—ভাল?

—খুব ভাল। এখানে ঘণ্টা কয়েক কাটালে মন খারাপ হবে না।

—হবেনাতো?

—না!

—তাহ'লে এখানে এনে ভাল করেছি বলুন।

—নিশ্চয়। একটু জোর দিয়ে বললো মীনা।

কমলেশ কিন্তু এখনো ভাবছে। বেশ ভাবছে।...পশ্চিমদিকের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে ঘরে ফিরে এসে একখানা চেয়ারে বসলো চুপ ক'রে। একবার চাইল মীনার দিকে। তারপর ডাকলো—

—সামাদ!

—হুজুর!

—কী খাওয়াবে এবেলায় বলতো?

—কী খাবেন বলুন হুজুর! মুর্গি—

—হ্যাঁ, মুর্গি আর ভাত। আর দেখ এই চেয়ারগুলো এক পাশে সরিয়ে মেঝেতে কিছু একটা বিছিয়ে দাও তো! এ ভাবে সাহেব হয়ে বসে এতগুলো ঘণ্টা তো কাটানো যাবেনা। তাই একটু ভারতীয় মতে—

—যে আজ্ঞে হুজুর।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই চেয়ার টেবিল সরিয়ে একখানা পুরাণো গালিচা বিছিয়ে দিয়ে গেল সামাদ—পাশের ঘর খুলে দুটো তাকিয়াও সে বার ক'রে দিল। বসবার যায়গা পেয়ে মীনা খুশী হয়ে উঠলো। সে মধুর হেসে নীচে নেমে বসে কমলেশকে জিজ্ঞাসা করলো—

—সামাদ আপনাকে চেনে—না?

—হ্যাঁ। ছাত্র জীবনে তো বহুবার এসেছি এখানে! তখন সামাদের বাবা ছিল কেয়ার টেকার। তাছাড়া—এদিক-ওদিক একটু আধটু বকশীষও যে না দিয়েছি, তা নয়। ফলে গরীব মানুষ—মনে রেখেছে উপকারীকে।

সামাদ ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলো—হুজুর, খানা তৈয়ার হতে তো একটু বেলা হবে। এখন কি কিছু ক'রে দেব?

এমনি পরিবেশ-মাহাত্ম্য, মীনা ইতি মধ্যে মনের দিক থেকে একটা মুক্তি অনুভব করছে। সে বললো—দাওনা সামাদ! দু'কাপ চা দাও—রুটি থাকলে একস্লিস্ ক'রে টোস্ট ক'রে দাও, আর একটা ক'রে পোচ্—কেমন? খুব বেশী কি কষ্ট দিলাম?

—না-না মেম সাব। আপনারা এসেছেন—এতো আমার নসীব। যা হুকুম করবেন—জান দিয়ে তা' করবার চেষ্টা করবো।

মেম সাব! সির্ সির্ ক'রে উঠলো মীনার শরীরের মধ্যে। মেমসাব কেন বললো সামাদ? এয়োস্ত্রীর কোন চিহ্ন তো নেই তার দেহে? তবে? পরক্ষণেই মনে হল—বললেই বা! কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হল তাতে? 'মেমসাব' কথাটার মধ্যে একটা মধুর ভবিষ্যৎ চকিতে উঁকি দিয়ে গেল।

আচ্ছা কেমন হয়? সে আর কমলেশ. ছোট্ট একটি নীড়—হাসি-গানে ভরা সংসার—একটি চাকর, একটি ঝি। মধুর ছন্দময় দিন-রাত্রির জীবনযাত্রা!··· কিন্তু নাঃ! সে হবার উপায় নেই। বাবা তার জন্য পাত্র নির্বাচন ক'রে রেখেছেন সুমোহন সেনকে। সুমোহনও সুন্দর ছেলে। জার্মাণী থেকে ডিগ্রী নিয়ে ফিরে এসে কোলকাতায় প্রকাণ্ড একটা গ্লাস ফ্যাক্টরী খুলেছে। চমৎকার ছেলে সুমোহনদা! বিয়ে তো কবেই হ'য়ে যেতো! কথা আছে মীনা পাশ ক'রে বেরোলে বিয়ে হবে, তার পরে দু'জনে যাবে কন্টিনেণ্টে হনিমুনের জন্য। সুমোহন বেশ ভাল ছেলে। কিন্তু সেতো কমলেশের মতো কবিতা লিখতে পারে না। সে অত্যন্ত ম্যাটার অব ফ্যাক্ট মানুষ। চাঁদ উঠলে যে শুধু সমুদ্রেই তরঙ্গ জাগে না—বুকের মধ্যেও তরঙ্গ তোলপাড় করতে থাকে, এ খবরই রাখে না সুমোহন। সেও দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ সুপুরুষ। সে গদ্য কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের,—শরৎচন্দ্রের নয়। আর কমলেশ হচ্ছে গুরুদেবের কবিতা পার্সোনিফায়েড! "তোমারে দেখিনু যবে কুঞ্জ বনে, তখনো আমের বনে গন্ধ ছিল, জানি না কী লাগি ছিলে অন্য মনে—হৃদয় দুয়ার কেন বন্ধ ছিল।" এই কবিতা যদি মানুষ হতো, তবে সে কমলেশের মতোই দেখতে হতো—সুমোহনের মতো নয়।

আকাশে মেঘ করেছে······

বাইরের ছোট্ট নারকেল চারাটির উপর বসে একটা দোয়েল ক্রমাগত শীষ দিচ্ছে, সেইদিকে চেয়ে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে এইসব কথা ভাবছিল মীনা। হঠাৎ কাণে এল—

—মীনা!

চমকে চাইল মীনা কমলেশের দিকে। দেখলো সে তার অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে। চোখের দৃষ্টিটা যেন কেমন কেমন। একেবারে অপরিচিত দৃষ্টি। বেশীক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না চোখের দিকে। মীনা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। তবু সবাইকে দমন ক'রে সহজ ভাবে বললো—কী ?

—একটা গান গাইবে ?

—তা' গাইতে পারি। কিন্তু হারমোনিয়ম তো—

—ওসব নেই। এম্নি গাইবে ?

প্রথম গুণ্ গুণ্ ক'রে আরম্ভ করলে মীনা। তারপর ধীরে ধীরে কণ্ঠঃকে তুলে দিলে চড়া পদায়। যেমন মধুর তার গাওয়ার ভঙ্গী, তেমনি মিষ্টি তার গলা। "হার মানালে গো, ভাঙিলে অভিমান।" কমলেশ চুপ ক'রে চেয়ে আছে মীনার মুখের দিকে। চোখ দুটি ওর আশ্চর্য বড় আর সুন্দর। যখনি সে ওই দু'টি চোখ কারুর মুখের ওপর রাখে, তখনি তার অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় সংগীন। সে যে কী করবে তা ভেবে পায় না, কী বলবে ঠিক করতে পারে না, শুধু মুগ্ধের মতো, মূঢ়ের মতো একদৃষ্টে চেয়ে থাকে মীনার মুখের দিকে।

গানের মাঝখানেই সামাদ খাবার নিয়ে আসতেই মীনা গান বন্ধ করলো। সামাদ বললো—ভয়ানক মেঘ করেছে হুজুর। বোধহয় খুব জল ঝড় আসবে। আমার রান্নার জিনিসপত্র এসে গেছে। আপনাদের আর কী লাগবে জানতে পারলে এনে দিই।

—না, আমাদের আর কিছু লাগবে না। বললো মীনা। তারপর কমলেশের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলো—আপনার লাগবে কিছু ?

—না। অত্যন্ত মৃদুগলায় কমলেশ উত্তর দিলো।

—আমি তাহ'লে এবার রান্না করতে গেলাম হুজুর।

—আচ্ছা। আবার বললো কমলেশ।

—আসুন খেয়ে নেওয়া যাক। মীনা খাবারগুলি সরিয়ে নিয়ে এল এবং আর কোন বাক্যব্যয় না ক'রে পরিবেশন ক'রে নিয়ে দু'জনে খেয়ে ফেললো। আহারান্তে ডিসগুলোকে একপাশে সরিয়ে রেখে বারান্দায় গিয়ে মীনা দাঁড়াল।

কমলেশও ঘর থেকে বেরিয়ে মীনার পাশে আসতেই একটা শেঁা শেঁা শব্দে দুজনেই চকিত হয়ে উঠলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এ...া প্রচণ্ড জল আর ঝড়। অনেক আগে থেকেই আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢেকে গিয়েছিল। ঘরের মধ্যে থাকার দরুণ দু'জনের কেউ সেটা খেয়াল করেনি। কিন্তু এখন জল ঝড়ের তীব্রতা দেখে মীনা বেশ ভীতা হয়ে পড়লো। ঘরে ফিরে এসে মীনা বললো—

—এ বৃষ্টি শীগগির থামবে বলে তো মনে হচ্ছে না।

—না। দিলে সমস্ত দিনের মুড্‌টাকে মাটি ক'রে!

—সত্যিই তাই। ম্লান গলায় বললো মীনা।

কিন্তু অসময়ের এই অকাল বর্ষণ দু'জনের মনেই কেমন যেন বিষণ্ণতার কুয়াশা সৃষ্টি করলো। দু'জনেই চুপ ক'রে চেয়ে রইলো নিশ্ছিদ্র বর্ষণের দিকে। সামনের মাঠটায় পাশাপাশি দু'টো নারকেল গাছের মাথা ঝড়ের দাপটে নুয়ে নুয়ে পড়ছে। পূব আর পশ্চিম দু'টো দরজা দিয়েই হু হু ক'রে বৃষ্টির ছাঁট আসছে, ওরা যেখানে বসে আছে সেখানে জল এলো বলে।

দু'জনেই যেন কেমন হয়ে গেছে। এই দুর্যোগটা যেন একটা দুঃসংবাদ। কোন এক সুর-বাঁধা রসঘন অভিনয় আসরের মাঝখানে শিশুর বিকট চীৎকারের মতো। সকাল থেকে মনে মনে তৈরী করা সমস্ত দিনের অখণ্ড আনন্দ-সূচীর মধ্যে একটা আকস্মিক বিশৃঙ্খলা। প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়ে তেল ফুরিয়ে যাওয়ার মতো। ভারী মন খারাপ হয়ে গেল মীনার।

—দরজা দু'টো বন্ধ না করলে মেঝেতে আর বসা যাবে না। টেবিলে উঠে বসতে হবে।

—বন্ধ ক'রে দেব? বললো মীনা।

—না, আমি দিচ্ছি। এই বলে কমলেশ উঠে গিয়ে দু'টো দরজাই বন্ধ ক'রে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘর ভরে গেল নীরন্ধ্র অন্ধকারে। ভয় পেয়ে মীনা অস্ফুটে চেঁচিয়ে উঠলো—

—কমলেশবাবু!

—এইতো আমি। ঠিক পাশ থেকে চাপাগলায় উত্তর দিল কমলেশ।

একটু নীরবতা। স্কাই-লাইটের মধ্যে দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুদ্দীপ্ত হয়ে উঠছে ঘরের অন্ধকার। গুরু গুরু গর্জনে মেঘ ডাকছে তার পরেই। সব যেন কেমন এলোমেলো, কেমন যেন আলু-থালু করছে মনের মধ্যে। মুহূর্তের জন্য মীনার মনে হল—একদৌড়ে বড় বেশীদূর চলে আসা হয়েছে। একটু চিন্তা করা উচিত ছিল…

—মীনা! ডাকলো কমলেশ। দরজা-জানালা বন্ধ করার পরে বৃষ্টির আওয়াজের মতোই সে আওয়াজ; প্রবল অথচ প্রখর নয়। নিশ্চিত কিন্তু নির্ভয় নয়। মীনা অন্ধকারের মধ্যেই ভাববার চেষ্টা করলো আর কখনো কমলেশ তাকে নাম ধরে ডেকেছে কিনা!

—মীনা!

—বলুন। খুব ভয়ে ভয়ে সাড়া দিল মীনা। হঠাৎ তার মনে পড়লো অনেক আগেই, আজকেই, কমমেশ তাকে 'তুমি' বলতে আরম্ভ করেছে। মন্দ নয়। তুমি বলাটা মন্দ নয়। দূরত্বের ব্যবধান কমে ওতে।….কী রকম করছে যেন শরীরের মধ্যে। গরম লাগছে কেন এতো?

অকস্মাৎ ভীষণ শব্দে কোথায় বাজ পড়লো। 'মাগো' বলে একটা আর্ত চীৎকার ক'রে চোখের পলকে কমলেশকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলো মীনা। নিঃশব্দে তার মাথাটা কমলেশ নিজের বুকের উপর রেখে নিবিড় ক'রে হাত দিয়ে বেঁধে রাখলো তার দেহ…

অপার নিস্তব্ধতা…শুধু বৃষ্টির শব্দ…শুধু ঝড়ের কান্না…শুধু…

থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে মীনার দেহ-বল্লরী। বেশ কিছুক্ষণ পরে কমলেশ ফিস্ ফিস্ করে বললো—আজ থেকে তুমি আমার। কাঁপছো কেন মিনু? দেখ, আজ আমরা মিলবো—তাই প্রকৃতি এই আয়োজন করেছে! আজ আমরা এখানে—এই অন্ধকারে—এক হয়ে যাব, মিলিয়ে যাব, মিশিয়ে যাব…… মীনু! মীনু!

মীনা অনুভব করলো কমলেশের উষ্ণ নিশ্বাস লাগছে তার গালে…ভালো… এই ভালো…এই করেছ ভালো…অন্ধকারে ভয়ে লাজে, চক্ষে কিছুই দেখি না

যে, বজ্রে তোলো আগুন ক'রে আমার যত কালো'।...তীব্র...তীক্ষ্ণ বেদনাময় আনন্দানুভূতির মধ্যে কৌমার্য্যের সমাধি-উৎসব......

বিছানায় শুয়ে তিনচার বার শিউরে উঠলো মীনা। ঢং ঢং ক'রে বেলা দু'টো বাজছে। বংশীধরের খাওয়া হয়েছে তো? হয়েছে বোধ হয়। সত্যি—কী লজ্জাকর মধুর অনুভূতি...। তারপর তো চারপাঁচ দিন সে চাইতেই পারেনি কমলেশের মুখের দিকে। কেবলই মনে হতো—এই লোকটা—তার যা কিছু গোপনতা জেনে ফেলেছে। নতুন কোন মোহ আর সৃষ্টি হবেনা, এই বন্ধুত্বের মাঝে। এরপর থেকে পড়া বইয়ের মতো—বৈচিত্র্যহীন ও বিরস হয়ে গেল মীনা।

কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তা হয়নি! প্রেম এলো বন্যাব মতো—জীবনের দুই কূল ছাপিয়ে। এত তার প্রবলতা, এত তার বেগ, এতই প্রচণ্ডতা যে, মীনার যেন নিঃশ্বাস ফেলবার সময় রইলোনা। ছ'মাস ধরে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বদলাতে লাগলো মিলনের রং, আর—রস। দেখতে দেখতে প্রেমের নিবিড় বন্ধনে বাঁধা পড়লো দু'জনে। কেউ কাউকে না দেখে থাকতে পারে না। দিনের মধ্যে ছ'ঘণ্টা, সাতঘণ্টা, আটঘণ্টা ক'রে কাটতে লাগলো—পরস্পরের সান্নিধ্যে।... অসহ্য হয়ে উঠলো হস্টেলের আইন কানুন।

অনুরাধা হস্টেল থেকে মাস দুয়েক হ'ল চলে গেছে নিজের বাড়ীতে বালীগঞ্জে। তার সঙ্গে দেখা ক'বে হাতে পায়ে ধরে তাকে রাজী করিয়ে এল মীনা। মুখচোখ লাল ক'রে অনুরাধা বললো—

—তুই হীরে মাটিতে ফেলে কাচ আঁচলে বাঁধছিস মীনু! পরে পস্তাবি!

—তুমি বুঝতে পারছোনা অনুদি। কমলেশের সঙ্গে আলাপ হলেই বুঝতে পারবে যে আমি ঠকিনি।

—না-না, তোমার ওপর আমার কোন সিম্প্যাথি নেই। তুমি তোমার বাবাকে অপমান করেছো, মাকে অপমান করেছো, তোমার পরিচিত যে যেখানে আছে, সবাইকে চাবুক মেরেছো তুমি। বিরস মুখে তার দিকে চেয়ে রইলো অনুরাধা। একটু পরে আবার বললো—

—কী বলবি তুই সুমোহনকে ? সে এর মধ্যে দু'দিন তোর খোঁজ করতে এসেছিল !

—সে কি ! মীনা চাইল অনুরাধার দিকে।

হ্যাঁ। প্রথমদিন আমি মিথ্যে কথা বলে তাকে সরিয়ে দিয়েছিলাম। আর একদিন যখন দেখলাম সে আমার কথা অবিশ্বাস করছে, তখন বাধ্য হয়ে সব কথা খুলে বলতে হল। চুপ ক'রে সব কথা শুনে সে কী বল্লে জানিস ?

—কী ?

—বললে, ওর মতো মেয়ের পক্ষে এই ঘটনা স্থায়ী হ'তে পাবেনা। এটা একটা দুঃস্বপ্ন। এ কেটে যাবে। এই বলে একটু থেমে আবার বললো— আচ্ছা, আমি তাহ'লে এখন আর আসবোনা। আপনি ওকে যেন ত্যাগ কববেন না অনুদি। ভয়ানক এক্‌সেন্‌ট্রিক্‌। কী করতে কী ক'রে বসবে, তখন আব ওকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। —এই ছেলেকে তুই পায়ে ঠেললি মীনা ?

—না। মীনা কুণ্ঠিত গলায় বলবার চেষ্টা করলো। —পায়ে ঠেলবো কেন ? কিন্তু কমলেশ—

—আই মা ! কমলেশকে বাবু বলাও ছেড়ে দিয়েছ ? দূর্‌হ, আমার সামনে থেকে পোড়ার মুখী !

সত্যিই রাগ হয়েছিল মীনার। সে আব কোন কথা না বলে সেদিন চলে এসেছিল অনুদির বাড়ী থেকে। কেন যাবে ? খালি বকা, বকা আব বকা ? এমন কোন অন্যায় করেনি সে, যার জন্যে দিবারাত্রি তাকে তিরস্কার শুনতে হবে দুনিয়ার লোকের। আর যায়নি সে।

সেই দিনই মিনার্ভায় ছবি দেখতে বসে হঠাৎ কমলেশ বললো—

—কিছুদিন থেকেই আমি একটা কথা ভাবছি মীনু !

—কী কথা ?

—আমরা একটা আলাদা বাড়ী দেখছিনে কেন ?

—আলাদা বাড়ী !

—হ্যাঁ। যেখানে কোন দর্শক নেই, সমালোচক নেই,—বিবাদ, বিসম্বাদ আর তিক্ততা নেই। "ধন নয়, মান নয় একটুকু বাসা।" কী বলো?

হঠাৎ যেন নেচে উঠলো মীরার সারা অন্তর। মুখে বলতে না পারলেও এই বোধ হয় এতকাল মনে মনে চাইছিলো সে। আর আপত্তিটা কিসের? স্বামী স্ত্রীর পালনীয় সব অনুষ্ঠানই তো শেষ হয়ে গেছে, এখন নীড় বাঁধার লগ্ন। জীবনের সমস্ত শাখা প্রশাখা ছেয়ে গেছে ফুলে, এবার ফল ধরার মহোৎসব।

—বেশ। আমার তাতে আপত্তি নেই। দ্যাখো একটা ছোট বাড়ী।

নাঃ। একটু চা খাওয়া যাক্! মীনা উঠে বসে ডাকলো—

—বংশী! ও বংশী!

—যাই। বংশীর সতর্ক উত্তর ভেসে এলো। পরক্ষণেই বংশীকে দেখা গেল দরজার উপর।

—আমায় একটু চা ক'রে দেবে?

—দিচ্ছি। বলে বংশী চলে গেল। মীনা উঠে গিয়ে ঘরের অন্যপ্রান্তে প্রকাণ্ড ড্রেসিং টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা আঁচড়াতে শুরু করলো। কী করা যাবে? কাজতো কিছুই নেই। প্রসাধন করা যাক।...এই বাড়ীতে আসাও হয়ে গেল আজ ন'মাস। এতদিন তো কোন অসুবিধেই ছিলনা, কিন্তু এইবার বোধ হয় দেখা দেবে আর্থিক সঙ্কট। কেননা বাবা অনেকদিন টাকা পাঠাননি। অবশ্য টাকা আসবে অনুদির ঠিকানায়। প্রথম তিনমাস যেমন যেমন টাকা এসেছে ঠিক তেমনি তেমনি অনুদি পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ছ'মাস থেকে কোন সাড়া শব্দ নেই। মনে হচ্ছে অনুদি বাবাকে সব কথা লিখে দিয়েছে, ফলে বাবার হয়েছে রাগ—হয়তো ব্যাপারটা আরও গড়িয়েছে। হয়তো মাও শুনে ফেলেছেন এই ঘটনা। ব্যস! রাগ ক'রে টাকা বন্ধ ক'রে দিয়েছেন।

উঃ। ঘড়ি যেন আর চলছে না। কতক্ষণে যে চারটে বাজবে, আর কতক্ষণে যে লোকটা বাড়ীতে আসবে, তার ঠিক নেই। ভগবান! আমাকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা দাও। যাতে ওকে আর কাজে বেরোতে না হয়। যাতে ওকে আমি আমার কাছেই দিনরাত রাখতে পারি!

বংশী চা নিয়ে এল। চা'টা রেখে ডিশ চাপা দিয়ে বংশী চলে যেতেই মীনা ড্রেসিং টুলটার ওপর বসে চায়ের কাপটি তুলে নিলো হাতে। কী ভীষণ একা লাগে বাড়ীতে কমলেশ না থাকলে। মাঝে মাঝে কান্না পায় মীনার। মনে হয় সবাই বুঝি ওকে একলা ফেলে কোথায় চলে গেল....

বেলা ৩টা থেকে ৬টা

'ফার্পোর' বিল চুকিয়ে দিয়ে কমলেশ যখন বাইরে এসে দাঁড়ালো, তখন বেলা দু'টো বেজে চল্লিশ মিনিট। ওঃ! অনেকক্ষণ বসে বসে খাওয়া গেছে তো! যাই হোক খাওয়াটা বেশ ভালই হয়েছে বলতে হবে। না খেলে বাঁচবে কী করে সে? তার বাঁচার খুব দরকার। পৃথিবীতে অনেক কাজ এখনো বাকী।

মাধ্যাহ্নিক চৌরঙ্গীর কর্মস্রোত মন্থর। একটু যেন ক্লান্ত, একটু ক্লিষ্ট। "যা লো বাবু সাড়ে ছ'আনা" বলে যে লোকটা ঠেলাগাড়ীতে দুনিয়ার মালপত্র চাপিয়ে এ পাড়া থেকে সে পাড়া চীৎকারে গগন বিদীর্ণ ক'রে বেড়ায় সেও এখন পরিশ্রান্ত হয়ে গাড়ীটা একপাশে রেখে একটা গাছতলায় পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। দু'টো কাক ওই মালগুলির উপর বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খাদ্যের খোঁজ করছে....

চুরি না করলে, ডাকাতি না করলে এ জগতে অস্তিত্ব বজায় রাখা কঠিন। অন্যেরটা দিয়ে তোমার চাহিদা মেটাও—এই হল মানব সৃষ্টির আদি 'মটো'। বসুন্ধরার বুক বিদীর্ণ ক'রে তুমি ধান ফলাচ্ছো, গাছের তপস্যালব্ধ ধন—তার ফলে তুমি ভিটামিন খুঁজছো, গরু, ছাগল, ভেড়া, মুর্গী তোমার নিত্যকার আহার্যের প্রোটিন। কেন? এরা দুনিয়ার দাবীদার নয়? তারাও কি তোমারি মতো জাগতিক সুখ সুবিধা, সূর্যের রশ্মি, চাঁদের আলো, নদীর জল আর মুক্ত বাতাস ভোগ করতে আসেনি?...অন্যের শরীরকে খাদ্যে পরিণত ক'রে তুমি নিজের শরীর রক্ষা করছো—তার কারণ তারা দুর্বল। সুখেন সরকারের দু'শোটাকা তুমি না নিলে আর কেউ নিতো। অতএব তোমার চাইতে যাদের বুদ্ধি কম, মেধা কম অথচ টাকা বেশী, তুমি তাদের কাছ থেকে নিতে পারো, বিশ্বসৃষ্টির কানুনে এটা পাপ নয়।

অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল কমলেশ ভাবতে ভাবতে। হঠাৎ তার সামনে

একখানি সুদৃশ্য মোটরকার এসে লাগলো। গাড়ীর জানলা দিয়ে একটি বছর চব্বিশ বয়সের যুবক মুখ বাড়িয়ে বললো—কমলেশদা, কোথায় যাবেন ?

—উঁ ? বলে কমলেশ তার দিকে নিস্প্রাণ চোখে চেয়ে রইল। প্রথমে মনেই করতে পারলো না একে সে কোথায় দেখেছে ? হঠাৎ মনে পড়লো—ও ! মস্ত বড় লোকের ছেলে। 'সুদক্ষিণা'য় এর গোটাকতক কবিতা ছেপেছিল বলে সে এখন কমলেশের অনুরাগী। নামটা যেন কী—, নামটা যেন—তার দিকে চেয়েই কমলেশ ভাবছে। মুখে মৃদু হাসি—মনে ভাবনা।

—জবাব দিচ্ছেন না কমলেশদা ?

—উঁ ? আবার বললো কমলেশ। নামটা যে কিছুতেই—হ্যাঁ হয়েছে, পার্থ। পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়।—কোথায় যাচ্ছ, পার্থ ?

—যাক্। নামটা মনে আছে তাহ'লে আমার। পার্থ হেসে বললো।

—মনে আছে মানে ? ডোণ্ট্ সে ছাট ? প্রায়ই মনে পড়ে তোমার কথা, অলমোস্ট রোজই মনে পড়ে। এইতো একটু আগেই লাঞ্চ খেতে খেতে হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়েছিল। কোথায় যাচ্ছো ?

—খুব একটা চমৎকার জায়গায়। যাবেন ?

—কোথায় ?

—আগে নাম বললে চার্ম নষ্ট হয়ে যাবে।

—এ গাড়ী কার ?

—কেন, আমার ! এইরে ! এতবার আমাকে মনে পড়ে বললেন,—আর আমার যে একখানা গাড়ী আছে, এটা বুঝি মনে পড়েনি আপনার ?

কমলেশের নিজের গালে মুখে চড় মারতে ইচ্ছে হোল। এমন এক একটা মারাত্মক ভুল ক'রে ফেলে সময় সময় যে সব কেঁচে যাবার জোগাড় হয়। সামলে নিয়ে সপ্রতিভের হাসি হেসে বললো কমলেশ—

—না, না। গাড়ীর কথা ভুলে যাবো কেন ? কিন্তু তোমার গাড়ীতো অন্য রকম ছিল !

—না। এইটেই বরাবর !

—কী জানি! মনে রাখতে পারিনে আর। তা'ছাড়া এসব সামান্য কথা চিন্তা করতে গেলে মানসিকতার অধঃপতন ঘটে।

—তা বটে। কই, উঠে আসুন!

—কিন্তু আমার নিজের প্যাকার্ডখানা যে ফিরে যাবে এসে!

—আপনার—? পার্থ ঢোক গিললো।—প্যাকার্ড!

—হ্যাঁ! সহজ গলায় বললো কমলেশ। কেন, আমার যে দু'খানা নিজস্ব মোটর আছে—তাকি তুমি জানতে না পার্থ? একখানা প্যাকার্ড আর একখানা হচ্ছে আইসোটা ফ্যাসিনী। অফ কোর্স,—দু'খানাই শ্বশুরের দেওয়া। আর তাঁর ঋণ কি করেই বা শোধ দেব? বাড়ী, গাড়ী, স্ট্যাটাস, এ সবই তো তাঁর দান। তবে তোমাকে মিথ্যে বলবো না ভাই,—এ সব ছাড়াও তিনি যে মেয়েটি আমায় দিয়েছেন—তা হচ্ছে—কী বলে গিয়ে,—একবারে যাকে বলে—"লাখে না মিলল এক।" যাক্‌গে, চলো!

এই বলে কমলেশ পার্থের গাড়ীতে উঠে বসলো। তারপর বললো—"চলো, কোথা লয়ে যাবে মোরে।" পার্থের অবস্থা ততক্ষণে বেশ কাহিল। সে স্বপ্নেও ভাবেনি যে—"সুদক্ষিণা"র সম্পাদক কমলেশ রায় কোন দিন তাকে তার নিজস্ব কার "আইসোটা"র কথা বলতে পারে। কেন না, কমলেশের মনে না থাকলেও —তার আজো স্পষ্ট মনে আছে—একদিন খেতে পাচ্ছি না বলে কমলেশ তার কাছে দু'টো টাকা ধার চেয়ে নিয়েছিল—সেই কমলেশ—! কী জানি!

—কতদিন বিয়ে করেছেন, কমলেশদা? প্রশ্ন করলো পার্থ।

—তা হ'ল বৈকি! বছরখানেকের ওপরই হয়ে গেল। আশ্চর্য হয়ে গেলে নাকি? অবশ্য ম্যারেজ হয়েছে ইণ্টার কাস্ট। লভ্‌ ম্যারেজ। শুনে অবাক হয়ে যাবে পার্থ—তোমার বৌদি হচ্ছেন বরোদা গাইকোয়াড়ের আপন ভাগ্নীর ভাগ্নী।

—এ্যাঁ! স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখেই মুখব্যাদন করলো পার্থ।

—হ্যাঁ। এই মেয়েটিকে যেদিন আমি দেখি, সেদিন আমি বিশ্বাস করতে চাইনি যে, রক্ত মাংসের মানুষ এত সুন্দরী হতে পারে। কী অসম্ভব রূপসী সে

আমি কী ক'য়ে বোঝাব তোমাকে। কী রকম জান পার্থ? ঠিক যেন স্বপ্নে দেখা নারী—। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি অবিশ্বাস্য রকমের ভাল।

একটা লোক চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। —ও! তাহ'লে এসব শ্বশুরের টাকা বুঝি?

—ন্যাচারালি! আমার শ্বশুরমশায়ও তো বিক্রমখণ্ড না কোথাকার যেন রাজা। বছরে আশী লাখ টাকা আয়।

—বাপ্‌স! পার্থের উত্তর।

—আরে! আমাকেও তো উনি কোলকাতায় রাখতে নারাজ। বলেন—আমার একটি মাত্র মেয়েকে নিয়ে তুমি বাপু কোলকাতায় বাস করবে, আর হাসিকে না দেখতে পেলে প্রজারা একদিন এসে আমায় মেরেই ফেলবে। হাসি হচ্ছে প্রজাদের চোখের মণি, বুকের নিধি। প্রজাদের ধারণা যে রাজ্যলক্ষ্মীই হাসির রূপ ধরে তাদের মধ্যে এসেছেন।

—তা' সেরকম যদি বোঝেন—চলে যাবেন বিক্রমখণ্ডে।

—তুই তো বল্‌লি চলে যাবেন। তারপর? আমার অবস্থাটা কী? বাংলাকে ছেড়ে, বাঙালীকে ছেড়ে—আমার সাহিত্য চর্চা ছেড়ে সেই শুক্‌নো মাটিতে থাকলে আমি যে মরে যাবো! কিন্তু তুই চলেছিস কোথায়?

—মাঠে।

—মাঠে!

—হ্যাঁ, আজকে শনিবার না?

—তোর এতদূর অধঃপতন হয়েছে পার্থ? তুই লেখা ছেড়ে দিয়ে রেস খেলছিস্?

—কী করবো কমলেশদা! আমার তো বিক্রম সোলাংকি শ্বশুর নেই, আর রাজ্যলক্ষ্মী স্ত্রীও নেই। কাজেই……

হো হো ক'রে হেসে উঠলো কমলেশ।

গ্র্যাণ্ডে গিয়ে ওরা যখন ঢুকলো, তখন সেই মাত্র তিন নম্বর রেস শেষ

হয়েছে। খুব একটা উত্তেজনার মুহূর্ত চলছে খেলোয়াড়দের মধ্যে। কোন একটা অখ্যাত অজ্ঞাত ঘোড়া নাকি ফার্স্ট হয়ে একটা মোটা ডিভিডেণ্ডের স্রোত বইয়ে দিয়েছে মাঠে। খবরটা কানে যেতেই পার্থ বলে উঠলো—

—বলে কি! "মাই লেডি" দিলো এত টাকা?

— টাকা তো মাই লেডিতেই দেয় ভাই। রসিকতা করলো কমলেশ।

—আরে রাখো তোমার রসিকতা। এঃ! আজকে তো ভারী গোলমেলে রেস হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। ওরে ও সুধাংশু শোন্! শোন্!

একটি পার্থের সমবয়সী যুবক এগিয়ে এল। —প্রথম বাজী কে মারলো রে?

—তিন নম্বর।

—হ্যাঁ, ঠিকই হয়েছে। ওখানে তিন নম্বর ছাড়া ঘোড়া নেই। —সেকেণ্ডটা?

—এক। বললো সুধাংশু।

—এক!

—এক।

—যা ব্বাবা! আজ সবই আপ্‌সেট? তুমি বস কমলেশদা। আমি একটু কনসাল্ট ক'রে আসি। পার্থ চলে গেল। কমলেশ চুপ ক'রে সুবিশাল জনতার দিকে চেয়ে রইল। নেশা নইলে মানুষ বাঁচবে না। যে কোন একটা নেশা তাকে করতেই হবে। মদের নেশা, গাঁজার নেশা, আফিমের নেশা,—তামাকের নেশা, পানের নেশা, স্ত্রীর নেশা,—ফুটবলের নেশা, ক্রিকেটের নেশা, ভ্রমণের নেশা, বক্তৃতার নেশা, আর কমলেশের হ'চ্ছে মানুষকে বোকা বানাবার নেশা। ছেলে বেলা থেকেই এই কাজটা কমলেশের ভাল লাগে। ওতে তার একটি আনন্দ আছে। "ইগো-স্যাটিস্‌ফ্যাকশান?" তা বলতে পারো! এই এতগুলো লোকের মেজাজ একটা জানোয়ারের মেজাজের উপর নির্ভর করছে। টাকা পাওয়াটা বড় কথা নয়। এর মধ্যে যে গোপন থ্রিল আর সাস্‌পেন্স আছে—সেটাকে আস্বাদ করতে এখানে মানুষ ছুটে আসে। যেমন অন্তত্র যায়—

স্ত্রী-কেন্দ্রিক মানুষ পারিবারিক অভ্যস্ত একঘেয়েমির হাত থেকে উদ্ধার পেতে। একই পদ্ধতি, একই প্রণালী—একই রুটিন পুরুষের পক্ষে মৃত্যু সমান……খেলবে নাকি দু'এক দান? মন্দ কি! একটু নূতনত্ব হবে তো!

—নমস্তে কবি! পাশ থেকে কে যেন বললো। চেয়ে দেখে কমলেশের বুকের মধ্যে ধড়াস ক'রে উঠলো। মনীষা! কী সর্বনাশ। ও এখানে কোত্থেকে এলো? আজ বছর চারেক ধরে হারিয়ে যাওয়া, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া, নির্মূল হয়ে যাওয়া মনীষা,—মদালসা, আয়তাক্ষী মনীষা, এই রেসের মাঠে...এই শনিবারের অপরাহ্নে আশ্চর্য!

—চিনতে চাইছো না মনে হচ্ছে কবি? মনীষা বললো।

—না-না চিনতে চাইবোনা কেন? কী মুস্কিল। কেমন আছো মনু?

—আ—হাঃ। ডাকটাও ভোলোনি দেখছি।

—এখনি ভুলবো? এত সহজেই ভুলে যাবো তোমাকে?

—রি-লিই! মধুর মাদকতাময় হাসি মনীষার ঠোঁটে।

—সিন্‌সিয়ারলি। বললো কমলেশ। কেমন আছো?

—ঠিক যেমনটি রেখেছো!

—আমি তাহ'লে মানুষকে ভাল মন্দও রাখছি আজকাল?

—আজকাল? চি—রো—কাল! তুমি হচ্ছো, "মারিলে মারিতে পারো রাখিলে কে করে মানা"। ঊষীদি কেমন আছে উইথ্ ইওর টু বাচ্চাজ!

অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো কমলেশ। অত্যন্ত বে-আইনী কথাবার্তা সুরু করলে তো মেয়েটা! কী ক'রে তাড়ানো যায়! রেসের মাঠেই বা ও এলো কী ক'রে? মনীষার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কমলেশ হেসে বললো—

—তুমি এখানে কেন?

—আমি! চোখ দু'টিকে সরু ক'রে বললো মনীষা।—এইতো আমার জায়গা। এই বলে তৎক্ষণাৎ গুণ গুণ ক'রে গাইতে সুরু করলো—

ঝরা পাতা আর ঝড়ে নেভা দীপ যারা
তোমাদেরি পৃথিবীতে
যাহাদের নাম লেখে নাই ইতিহাস—
মোর এই গান খুঁজে ফেরে সেই নীরব
দীর্ঘশ্বাস।

তা সে রেসের মাঠেই হোক আর শেষের মাঠেই হোক। হাঃ! হাঃ! হাঃ! —এই বলে মনীষা উঠে দাঁড়াল চলে যাবার জন্য।

ক্র্যাক্‌ড্‌ হয়ে গেছে নাকি? চকিতের জন্য মনে হল কমলেশের। তাহ'লে সর্বনাশ করবে দেখছি। ওকে কাছে বসিয়ে রাখা দরকার।—মনু! ডাকলো কমলেশ।

—উঁঃ – হুঁঃ!....কবি কবে ডেকেছ এই ডাক, কোন আদিম বসন্তপ্রাতে···। এই বলে চুপি চুপি নিজের মনেই বললো—"তবু যেন মনে হয় সেদিন সকাল"। ···হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ কই বললে না তোমার বাচ্চারা কেমন আছে?

—ভাল।

—আমার সেই বাচ্চাটাকে (কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললো মনীষা) ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছিলাম তো! কী আশ্চর্য! ছোকরা মরতে প্রায় ছ'ঘণ্টা টাইম নিয়েছিল! অদ্ভুত ভাইটালিটি! বাংলা দেশের কবির ছেলে তো!

বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে কমলেশের কপালে—এই শীতেও। সে নিজে গ্রহ নক্ষত্র রাশি চক্র এ সব কিছুই মানেনা। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে লোকে বোধ হয় এই রকম একটা সময় বা মুহূর্তকেই ফাঁড়া বলে। ঈশ্বরকে স্বীকার করার আজ পর্যন্ত কোন কারণ ঘটেনি কমলেশের। কিন্তু আজ তার বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, ভগবান বাঁচাও! মনীষা সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গেছে। ও যে আরও কত কী বলবে তার ঠিক নেই। ওকে কোন রকম ক'রে এখান থেকে ভুলিয়ে নিয়ে যাও ভগবান!

—কবি! মনে পড়ছে না বুঝি? মনীষা বললো।

—না না মনে পড়বে না কেন? কিন্তু ধান ভানতে তুমি শিবের গীত গাইছো কেন মনু? আমিতো কেবলমাত্র তোমার কুশল প্রশ্ন করেছি।

—ও! তাই বুঝি? মনেই থাকেনা ছাই, আমার সব কথা। এইটুকু জীবনের মধ্যে ঘটনাই কি কম ঘটলো নাকি? অবশ্য প্রধান ঘটনার ঘটক তুমি। মরুক্‌গে। তারপর কোথায় আছ কবি?

—আমি! আমিতো এখনো সেই কালীঘাটেই—

—উঁ। আবার মিথ্যে কথা বলে! আচ্ছা, ভুলেও কি কোনদিন তুমি একটা সত্যি কথা বলবেনা কবি? ওগো! উষীদির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল যে!

—সেকি।

—হ্যাঁগো! মনীষা হেসে উঠলো।

—আহা! বেচারার কী যে কষ্ট! দু'টি বাচ্চা নিয়ে কোনদিন খায়, কোনদিন খায়না। ও আবার ভগবানে বিশ্বাস করে তো! তাই, কালীঘাটের ছবিটার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদে।···এই বলে মনীষা যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল, তারপর নিজের মনেই বললো—

—আমার কাছেতো বিশেষ কিছু ছিলনা। তাই দশটা টাকা দিয়ে এলাম। কবি! এটা তুমি ভাল করছোনা। ছেলেদুটোকে স্কুল ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে আর ছোটলোকদের ছেলেপুলেগুলোর সঙ্গে দিন রাত্তির আড্ডা দিয়ে বেড়ায়—ওয়েস্টেজ্‌ অব লাইফ!

—আচ্ছা, আমি যাবো একবার। কেন, টাকাতো আমি রেগুলার পাঠিয়ে দিই! তবু—

খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো মনীষা। আবার সেই মিথ্যে কথা। কবি, তুমি আমার কাছে মিথ্যে কথা বোলোনা। আমি তোমার ভালই চাই। যদি তা না চাইতাম, তবে কোলকাতা সহরে আজকে এই দামী স্যুট পরে রেসকোর্সের ময়দানে তোমাকে খুঁজে পাওয়া যেতোনা। কলংকের কালো কালীতে গোরাচাঁদ,

তুমি কালো হয়ে যেতে। কিন্তু আমি করেছি কি সে সব কিছু? করিনি, কারণ তুমি এতই ছোট যে তোমাকে শাস্তি দিতেও লজ্জা করে আমার।

এমন সময় সৈনিকের পোষাক পরা এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন সেখানে। তাঁর দিকে চেয়ে মধুর হেসে বললো মনীষা, আই এ্যাম্ কামিং ডারলিং... তারপর কমলেশের দিকে চেয়ে বললো—আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে জানতো? হ্যাঁ, আই হ্যাভ বিন—তা'ছাড়া তারা করেই বা কী? মেয়ে প্রেমের নামে নিজের ভ্যানিটি ব্যাগে দুর্নীতি ভরবে, কোনো 'সেন' বাপ-মা এটা সহ্য করবেনা। তাই এখন—রেস খেলি, নাচে যাই, হোটেলে যাই, মাসাজ বাথে একটা চাকরী নেবো কিনা, তাও ভাবছি সিরিয়াশলি। উঁ? যাই এবার? আমার বন্ধু দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। যাই—এবার? কবি? যাই এবার? যেতে বলো আমাকে!

এই বলে দু'এক পা এগিয়ে মুখ ফিরিয়ে বললো—তুমি কিন্তু যেখানেই থাকো উষীদিকে কিছু কিছু পাঠিয়ো। আমরা তবু হাতে রেখে ভাল বেসেছিলুম, কিন্তু ও একেবারে ফতুর হয়ে গেছে।

মনীষা চলে গেল। শোনা গেল সে তার পাঞ্জাবী বন্ধুকে বলতে বলতে চলেছে. 'নো, নো, নম্বর এইট্ মাস্ট উইন। ইউ সি ত্য স্পার্ট!

একটা ঝড় বয়ে গেল যেন। কী যে হয়ে গেল, কিছুই বোঝা গেলনা। যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ বক্ বক্ করলো, কাঁদলো, হাসলো, বক্‌লো—চলে গেল। অথচ এই মনীষা—!

আর একটা রেস হচ্ছে। জনতা দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ফেন্সিং-এর ওপব ঝুঁকে পড়েছে। ঘোড়ার নামধরে চীৎকাব করছে, যতক্ষণ অবধি নম্বর ডিক্লেয়ার্ড না হচ্ছে, ততক্ষণ অবধি চলবে এই চীৎকার। স্থির হয়ে বসে রইল কমলেশ। হিন্দুস্থান পার্কের অভিনয়। মনীষা দেবযানী, কমলেশ কচ। রূপে আর যৌবনে ঝলমল করছে মনীষা। ভাল লাগা সুরু হয়েছিল রিহারশ্যাল থেকে, ভালবাসা এল অনেক পরে। রিহারস্তালের সময় যখন মনীষা তার বড় বড় চোখ দু'টো তুলে বলতো:

"কত দিন যেমনি তুলেছ মুখ, চেয়েছ
যেমনি ; যেমনি শুনেছ তুমি মোর
কণ্ঠধ্বনি, অমনি সর্বাঙ্গে তব কম্পিয়াছে হিয়া ;
নড়িলে হীরক যথা পড়ে ঠিকরিয়া আলোক তাহার।
সে কি আমি দেখি নাই ? ধরা পড়িয়াছ
বন্ধু, বন্দী তুমি তাই মোর কাছে।
এ বন্ধন নারিবে কাটিতে।"···

সত্যি, বন্ধন দৃঢ়তরই হয়েছিল। এক এক সময় কমলেশের মনে হতো—ওকে আদর ক'রে ভেঙে চুরে তচনচ ক'রে দিই। কিন্তু বেশী দিন অপেক্ষা করতে হ'লনা,—অতি অল্প আয়াসেই ধরা দিলো মনীষা। গঙ্গাবক্ষে নৌকার উপর সেই রাখীপূর্ণিমার রাতটি এখনো মনে পড়ে কমলেশের। কত দিন···কত রাত্রি ···কত মুহূর্ত।···তারপর জীবনের মিছিলে পিছিয়ে পড়লো মনীষা। হারিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। যত দিন যাচ্ছে ততই যেন মেয়েদের জীবনের একটি দিক কমলেশের কাছে স্পষ্ট হচ্ছে। সেটি হচ্ছে—ওরা যখন নিজেকে দেয়, তখন কিচ্ছু হাতে না রেখে, মনে মনে দেউলে হবার মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে নিজেকে একেবারে নিঃসর্তে ছেড়ে দেয়, প্রেমাস্পদের হাতে। চিত্রাঙ্গদার মতো তখন ওরা বলে—"লহো, লহো যাহা কিছু আছে, সব লহো জীবনবল্লভ"···

অনেকদিন পরে, আজকের এই দিনে, এই রেস ময়দানে গ্র্যাণ্ডের আসনে বসে আজ যেন কমলেশ একটু চমকে উঠলো। তার মনে হল—শুধু মনীষা-উষা মীনাইতো নয়, আরও তিন চারটে মেয়ে এইভাবে হারিয়ে গেছে তার জীবনে-তিহাস থেকে। একে একে, ধীরে ধীরে, অল্পে অল্পে, একটু একটু ক'রে সরতে সরতে তারা পিছিয়ে পড়েছে প্রাণের পথের কোন বাঁকে—আজ আর তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। এদের মধ্যে বুলুকে মনে পড়ছে আজ। বুলু—

কিন্তু পার্থটা গেল কোথায় ? কমলেশ উঠে দাঁড়াল। তার পর এক পা এক পা করতে করতে এগিয়ে গিয়ে রেস্তোরায় বসলো, অর্ডার দিলো এক কাপ কফির।···অনেক দীর্ঘ নিঃশ্বাস, অনেক চোখের জল ঝরেছে তার জন্য। কিন্তু

তাদের কথা ভাবতে গেলেতো বাঁচাই যায় না মোটে। পৃথিবী হচ্ছে সুবিধাবাদীর জায়গা। এক ইঞ্চি জমির জন্য একটা মহাযুদ্ধ হতে পারে, আর গোটাকয়েক বোকা মানুষের, আহাম্মক মেয়ের নির্বুদ্ধিতার সুযোগ নিয়ে সে নিজের সুখ সমৃদ্ধি আহরণ করলে কী দোষ? বোগাস্!

পাশের চেয়ারে এক ভদ্রলোক একটা বিরাট নোটের তাডা গুনছেন, বোধ হয় ট্রেবল টোডের টাকা। মোটা সোটা কালো চেহারা—চোখে লাইব্রেরী ফ্রেমের চশমা। গায়ে গরম কাপড়ের পাঞ্জাবী, ডানহাতের আঙুলে চারটে আংটি। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু বোধ হয় নীলা, পলা, জামোনিয়া বা ওই জাতীয় কিছু। কফিতে নিঃশব্দে চুমুক দিতে দিতে আড় চোখে সেই দিকে চেয়ে কমলেশ ভাবতে লাগলো—গ্রহ-নক্ষত্রে আস্থাবান পুরুষ। অর্থাৎ ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানুষ।

অনেক্ষণ চুপ ক'রে বসে বসে কফি খেতে খেতে ভদ্রলোককে লক্ষ্য করতে লাগলো কমলেশ। আরও কিছুক্ষণ পরে আর এক কাপ কফির অর্ডার দিয়ে উঠে গিয়ে ভদ্রলোকের টেবিলে গিয়ে বসলো, তারপর কোনরকম গৌরচন্দ্রিকা না ক'রে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলো—

—দাদাকে এর-আগে কোথায় দেখেছি বলুন তো?

—আমাকে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কিন্তু আমিতো—! তা দেখতে পাবেন, রাস্তা ঘাটেই দেখে থাকবেন।

—রাস্তাঘাটে?

—হ্যাঁ। তাই দেখে থাকবেন। নইলে আর কোথায় দেখবেন। কাজের লোক, রাস্তা ঘাটে চলা ফেরা করিতো!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাতো বটেই। তবে আমার কেবলি মনে হচ্ছে আপনাকে আমি পথে ঘাটে দেখিনি, দেখেছি—আমাদের গ্রহাচার্যের ওখানে।

—কোন গ্রহাচার্য? টালিগঞ্জের—

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তান্ত্রিক। বললো কমলেশ। শুধু তাইনা, সেখানে

আপনাকে দেখেছি এবং—মনে হচ্ছে—সেখানে আপনার সঙ্গে আমার আলাপও হয়েছিল।

—তা হতে পারে। ভদ্রলোক এতক্ষণে যেন একটু সহজ হয়েছেন। আমার আবার ওই সব ভয়ংকর বাতিক।

—আমি জানি, আমি জানি। মধুর হেসে বললো কমলেশ—কালীবাবুর ওখান থেকে আপনার সব ইতিহাস আমি জানি।

—কালীবাবু কে?

—কেন, গ্রহাচার্য!

—বাঃ! মশায় বাঃ! তাঁর নামতো কালী বাবু নয়! তাঁর নাম কেষ্ট বাবু।···চাপা হাসি হাসলো কমলেশ। তারপর একটু হেসে বললো—তাও জানি। তবে আমি যে মরে আছি। আমার যে ওসব নাম করবারই উপায় নেই।

—কেন?

—যে নাম বললেন, তিনি যে আমার ইষ্টদেব। ওই মন্ত্রই যে আমি কালীদার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছি। কুড়িটি বচ্ছর নাম করা চলবেনা। বুঝেছেন দাদা? বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা! কুড়ি বছর পরে সিদ্ধিলাভ করলে তবে নাম করা যাবে।

—হুঁ!

এতক্ষণে ভদ্রলোক বিগলিত হলেন। বিশ্বাসের একটা স্রোত বয়ে গেল তাঁর শিরদাঁড়ার মধ্য দিয়ে। ঈষৎ হেসে সামনের গুটি তিনেক দাঁত বার ক'রে বললেন—আপনাকে দীক্ষা দিয়েছেন? কেষ্টদা?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু উনিতো কাউকে দীক্ষা দেননা!

—যাকে দেন আমিই সেই ভাগ্যবান। ···আপনি গিয়েছিলেন নাকি এর মধ্যে?

কমলেশের স্বরে আগ্রহ।

—হ্যাঁ। কয়েকদিন আগে গিয়েছিলাম একবার।

—আমি কাল একবার যাবো ভাবছি। হঠাৎ একটা এমন বিপদে পড়েছি-

যে আর দেখা না করলে চলছেনা। দু'ওয়াগন সিজনড্ টিম্বার শালিমারে আজ এসে পৌঁছেচে। পরশুর মধ্যে রিলিজ করতে না পারলে ডেমারেজ খাবে। ব্যাপারটা জানেন? তিনটাকায় সি-এফটি কেনা, বেচবো ন' টাকা বে-ওজর।

—সি-এফ-টি?

—কিউবিক্ ফুট। টুহান্ড্রেড পারশেণ্ট লাভ আশা করছি।

—হ্যাঁ, তাতো দাঁড়ালোই!

—গত বছর বাজারে এই সিজন্ড টিম্বারে—আমার লাভ এসেছে—প্রায় হাজার দশেক টাকা।

—এবার টাকায় আটকাচ্ছে বুঝি?

—আবার কিসে? তাই একবার কালীদাকে জিজ্ঞাসা করবো যে, এটা হল কী? জীবনে আমি তো কারুর কোন ক্ষতি করিনি। যা আছে হাতে, তার ওপর আরও হাজার খানেক টাকার দরকার। তবে দাদা, এটা আমি জানি, ও টাকা যদি আমার হকের হয় তবে আমিই পাব, এবং কালকে আমার হাতে টাকা আসবেই আসবে।

—হুঁ! ভদ্রলোক কী যেন চিন্তা করছেন। আড়চোখে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে কমলেশ আবার সুরু করলো: —না-না। ও লাইনে চিন্তা করবেন না দাদা, ওতে কোন সুবিধে হবেনা। তা ছাড়া আমি নিজেই নেবোনা যে!

ভদ্রলোক যেন একটু অবাক হয়ে কমলেশের মুখের দিকে চেয়ে বললেন—আমি কী ভাবছি বলুন তো?

—ভাবছেন, চেনা লোক, হাজার খানেক টাকা দিয়ে কাঠটার শেয়ার নিলে কেমন হয়? এইতো—

হা-হা-ক'রে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলো কমলেশ। —আমার কাছে লুকোবার চেষ্টা ক'রে কী করবেন দাদা? আমি যে 'কাক চরিত্র' জানি। দশবছর বয়সে বাড়ী থেকে পালিয়েছিলাম, চব্বিশে ফিরে আসি। কোথায় ছিলাম জানেনতো?......ভদ্রলোক চেয়েই আছেন কমলেশের দিকে। —তিব্বতে।

—এঁ্যা! ভদ্রলোকের মুখ থেকে শুধু এ্যা শব্দ বেরোল।

উৎসাহিত হয়ে উঠলো কমলেশ। অনেকটা এগিয়েছে—সাফল্যের চূড়া ওই দেখা যায়। আর একটু কষ্ট ক'রে, তর্ক হয়ে, কয়েকপা চল্লেই-কেল্লা মাৎ! কোন অধিকার নেই ওর এতগুলো টাকা নিয়ে বাড়ী ফেরার।

—কাক চরিত্র জানেনতো? এই কাক চরিত্র শিখে কতলোকের যে মনের কথা বলে দিয়েছি সে আর বলবার নয়। দ্বারভাঙ্গার ভূমিকম্পে মহারাজাকে আমিই প্যালেস থেকে মাঠে এনে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম জানেন? যে বাড়ীটায় উনি ছিলেন সেটা একেবারে ভূমিসাৎ হয়ে যায়।

—বলেন কি মশায়!

ওই রকমই বলি। উনি এর জন্য আমাকে এই হীরের আংটিটা দেন। (হাত তুলে দেখাল কমলেশ)। আমি আপনার কাছে আসবার আগে আপনি কী ভাবছিলেন বলি? আপনি ভাবছিলেন টাকাগুলো বাড়ী নিয়ে যাওয়া উচিত কিনা! যদি ছেলেটা খোঁজ পায়, তবে—

—ছেলে নয়, ছেলে নয়, ভাইপো।

—ওই হল। পুত্রস্থানীয়। আপনার নিজের তো কিছু নেই। কিন্তু কি করবেন বলুন? আপনার স্ত্রীর প্রশ্রয়ে এটা হয়েছে।

—ঠিক—ঠিক—ঠিক—ঠিক। ভদ্রলোক সোৎসাহে দম দেওয়া পুতুলের মত দুলে চললেন। ঠিক। ব্যস ব্যস, আমি আপনাকে বুঝে নিয়েছি। হাজার টাকা আমি দিচ্ছি আপনাকে। আপনার লাভে আমার পঞ্চাশ থাকলো। কেষ্টদার ওখানেই দেখা হবে। আশ্চর্য! আশ্চর্য। আপনি দাদা এই রেসের মাঠে কেন?

—প্রাক্তন। যুধিষ্ঠিরকেও নরকদর্শন করতে হয়েছিল। আজ সকালে ধ্যান-ঘরে বসেই নির্দেশ পেলাম—এখানে আসার। তাই—

—থাক—থাক! পরে আরও আলাপ হবে। এখন এই টাকাটা—ভদ্রলোক টাকার তাড়া বার করলেন।

—মাপ করবেন। উঠে দাঁড়াল কমলেশ। যতক্ষণ না আত্মার নির্দেশ পাবো, ততক্ষণ কিছুতেই ও টাকা নিতে পারবোনা। তা'ছাড়া টাকা নিলেইতো

সংকট মিটে গেল, পরীক্ষা আমার হলো কই? চিন্তা করবেন না। কাঠ যখন এসেছে, তখন টাকাও কোথাও না কোথাও এসেছে।......এই বলে কমলেশ ব্যাগটি নিয়ে বললো—নমস্কার! চলতে লাগলো সে। ভদ্রলোক যেন মরীয়া হয়ে উঠলেন টাকা দেবার জন্য। দৌড়ে এসে ধরলেন কমলেশকে। দাদা! দাদা! দেখুন আমার মন বলছে এই টাকা আপনি নিয়ে না গেলে খোয়া যাবে। ঠিক খোয়া যাবে। তা'ছাড়া কেষ্টদাও জীবনে আর আমার মুখ দেখবেন না।

কমলেশ ধাঁ ক'রে জ্বলে উঠলো।—কেন আপনি বার বার আমাকে টাকার লোভ দেখাচ্ছেন? আপনি জানেন না। কালীদার নাম করলে গুরুর মান রাখতে সে কাজ আমাকে করতেই হবে। ছি ছি ছি! কই দিন টাকা! আমাকে আপনি জানেন না শোনেন না, আমি যে জোচ্চোর নই, তার কী প্রমাণ আপনি পেয়েছেন? টাকা যে জীবনে আপনি ফেরৎ পাবেন, তাইবা আপনাকে কে বললে?

—আমার মন, আমার মন। এই বলে সেখানে দাঁড়িয়ে, গুনে গুনে একটি হাজার টাকা গুনে দিলেন কমলেশকে এই ভদ্রলোক। দেখতে দেখতে আশে পাশে লোকজন জমে গেল। দু'একজন জিজ্ঞাসা করলো—কী হয়েছে দাদা?—পকেট কাটছি দাদা! বললো কমলেশ।

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কমলেশ টাকা রাখলো ব্যাগে। তারপর কড়া গলায় বললো, নামটা বলুন দয়া ক'রে এবার! খুবতো উপকার করলেন—

—আমার নাম শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র পুর-কায়স্থ।

—কালীদার ওখানে পরশু সন্ধ্যার সময় থাকবেন। টাকাপয়সা সবই আপনাকে ফেরত দিয়ে আসবো।

কমলেশ এগিয়ে গেল। দেখা গেল প্রকাশবাবু সেইখানে দাঁড়িয়ে কমলেশের দিকে চেয়ে তাকে যুক্তকরে প্রণাম করছেন ..।

এইমাত্র শেষ বাজীর ঘোড়া ছুটে গেল—চোখের সামনে দিয়ে, কত লোকের [illegible], স্ত্রীর গয়না, বাপের কষ্টার্জিত অর্থ, রেশনের টাকা, অনাহার, অনটন,

দারিদ্র্য, হাহাকার, অপমান, অপমৃত্যু দৌড়ে গেল ওই ঘোড়াগুলোর সঙ্গে অনিশ্চিতের দিকে—তার ঠিক নেই,⋯ওই ঘোড়ার হার-জিতের সঙ্গে মনুষ্যত্ব হারছে আর জিতছে।

কমলেশ একপা একপা ক'রে হাঁটছে, চোখ রেখেছে জনতার মধ্যে পার্থের সন্ধানে, আর তার মন কইছে কথা। পৃথিবীতে বাস করবার জন্য মানুষ কতরকম ফন্দীই বার করেছে, বেঁচে থাকাটার মধ্যে বহু প্রকার উত্তেজনার আমদানী ক'রে নেশার প্রকার ভেদ করছে। কমলেশ কী করছে? তারও জীবন কি ওই রকম কতকগুলি খণ্ড উত্তেজনার সমষ্টি নয়? এরা ধরেছে ঘোড়ার উপর বাজী, সে ধরে মানুষের উপর। তফাৎ কোথায়? কিছু তফাৎ নেই। এক হিসেবে তার জুয়াটাই নিকৃষ্ট।

হঠাৎ পকেটে টান পড়তেই সচকিত হয়ে পাশে চাইতেই কমলেশ দেখতে পেলো তারই বয়সী একটি ছেলে তার ডানপাশের পকেটটি কেটে ফেলেছে এবং নিঃশব্দে হাতও ভরে দিয়েছে। তৎক্ষণাৎ কমলেশ তার হাতটা চেপে ধরলো, সঙ্গে সঙ্গে লোকটার মুখে চোখে ভয় ফুটে উঠলো। সে হাত ছাড়াবার জন্য ছটফট করতেই কমলেশ চুপি চুপি বললো, আর একদিন, কেমন? আজকে পার্সের অবস্থা তেমন ভাল নয়, তা'ছাড়া টাকাকড়ি কিছু বাড়ী নিয়ে যাওয়া দরকার। তোমারও কি খুবই প্রয়োজন?

—আমাকে ছেড়ে দিন দয়া ক'রে। লোকটি কাঁদো কাঁদো মুখে বললো। আরও চুপি চুপি বললো কমলেশ—গোটা পাঁচেক নিলে আজকের মতো কাজ চালাতে পারবে? তাহ'লে দাঁড়াও, আমি দিচ্ছি পাঁচটাকা। এই বলে তার হাত ছেড়ে দিয়ে কমলেশ যেই ব্যাগ খুলতে গেছে, অমনি লোকটা "পড়িতোমরি" ক'রে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়ে গেল⋯

হাসলো কমলেশ। কাকে কখনো কাকের মাংস খায় না। ও না বুঝে হাত দিয়েছিল পকেটে। যাই হোক, নিলে ভয়ঙ্কর কিছু একটা নিতো না। মানিব্যাগটায় মীনার দেওয়া পঁচিশটা টাকার গোটাকুড়ি মাত্র ছিল। তাহ'লেও, টাকা চুরি যাওয়াটা দুর্লক্ষণ। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করা টাকা চোরে নিয়ে যাবে? মাইরী আর কি!

কিন্তু পার্থ তো আচ্ছা কেলেংকারী করলে দেখছি। সেই যে তাকে বসিয়ে রেখে কেটে পড়লো তার আর কোন পাত্তা নেই! যাই হোক পাওয়া যাবেই। না যায়, একখানা ট্যাক্সি ক'রে বাড়ী ফিরে যাওয়া যাবে। আর একবার বাড়ী যেতে পারলেই অনন্ত শান্তি, অপার সুখ, অজস্র স্বাচ্ছন্দ্য এবং অপরিমেয় অধরসুধা।

মীনা—মীনা—মীনা। মীনা তার জীবনে সৌভাগ্যের সমারোহ এনেছে। লাঞ্ছিত পদাতিক বৃত্তি থেকে তাকে উন্নীত করেছে বাঞ্ছিত রথীত্বে। ধন্য হয়েছে কমলেশ। জন্মান্তর যদি মানতে হয়, তবে একথা বলতেই হবে, পূর্বজন্মে অনেক সুকৃতি ক'রে এসেছে কমলেশ। এই প্রাপ্তি—সেই পুণ্যফলের ভগ্নাংশ মাত্র।...

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এতক্ষণে মীনার গা ধোওয়া চুল বাঁধা হয়ে গেছে। একখানি ফল্‌সা রঙের শাড়ী ওর তনুদেহ ঘিরে। ঘরের আলো ঈষৎ নীলাভ, চাঁদের আদলআনা পরিস্থিতি। গা এলিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে মীনা। ঘরের শূন্য ভ'রে শেফালীর হাতছানী। ঠিক এই সময়টায় মনে না এলেও কমলেশের কণ্ঠে আসে গান। অবশ্য একথা নিঃসংশয়ে সত্য যে গান রবীন্দ্র নাথের "ফুল বলে ধন্য আমি ধূলির পরে।" এগান কার উক্তি, স্ত্রীর না পুরুষের তা জানে না কমলেশ। জানবার দরকারও নেই। শুধু সে যে মীনাকে পেয়ে, তাকে স্পর্শ ক'রে ধন্য হয়ে গেছে, এই কথাটাই বারে বারে প্রকাশ করতে চায়। শুয়ে থাকার মধ্যে যে, নারীর একটা লীলায়িত লাস্য লুকিয়ে থাকে, তা মীনাকে আধশোয়া অবস্থায় না দেখলে কিছুতেই বোঝা যাবেনা।

হঠাৎ দূরে পার্থকে দেখতে পেয়ে কমলেশ চেঁচিয়ে উঠলো—

—পার্থ! ওরে পার্থ! কীরে রাস্কেল! ডুবতো ডুব একেবারেই ডুব।

—ডুব নয় কমলেশদা! পেমেণ্ট নিচ্ছিলাম।

—কিসের পেমেণ্ট!

—আমার এ-বাজীর টাকা। আঃ! কমলেশদা! কী মোক্ষম বাজীই ধরেছিলাম। ফোরকাস্ট ইভেণ্ট-এ কী রকম মেরেছি জান? এ দু'টো বাজীতে? একটায় সাতশো বায়াম, আর একটায় দু'শো বত্রিশ। চলো।

দু'জনে মিলে যখন গাড়ীর কাছে এসে দাঁড়ান, তখন চার পাশে প্রচণ্ড ভীড়।—তুই চুপ ক'রে বোস দিকিনি, আমি এবার তোর গাড়ীটা চালাই। —তোমার প্র্যাকটিস্ আছেতো?—ইনঃ!লটীং! তুই দিনকে দিন একটা ভূত হচ্ছিস! ড্রাইভারে আমার গাড়ী চালায় বলেকি, এতই ইনপ্র্যাকটিভ্ হয়ে গেছি নাকি? এই বলে গাড়ীতে যখন স্টার্ট দিলো কমলেশ, ঠিক তখনই তার পাশ দিয়ে যাচ্ছে সেই হাতে আংটিওয়ালা জ্যোতিষ-বিশ্বাসী ভদ্রলোক। এতবড় গাড়িটা কমলেশকে চালাতে দেখে তাঁর চিত্ত আবার উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। তিনি হেঁট হয়ে কমলেশের পায়ের ধুলো নিতে গিয়ে গাড়ীর পেছন দিকটা স্পর্শ করলেন শুধু। কমলেশ যে নিজে কত বড়লোক, এইবার তাঁর এই জ্ঞান হলো।

কমলেশের গাড়ী ততক্ষণে যানজটিলতায় পথ খুঁজছে…

সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৯টা

বাথরুম থেকে ফিরে ঘরে এসে মীনা সুইচ টেনে আলো জ্বেলে দিলো। তারপর দরজাটি বন্ধ ক'রে শাড়ীটা বদলে একখানা নতুন ডিজাইনের মেঘ-রঙা ক্যালিকো শাড়ী পরলো। আয়নায় আর একবার নিজেকে দেখলো। আঃ! সে পুরুষ হ'লে এই চেহারার সঙ্গে প্রেমে পড়তে পারতো।

কিন্তু এ মানুষটার কী ব্যাপার? পাঁচটায় বাড়ী ফিরে আসার কথা, ছ'টা বেজে গেল, সাতটাও প্রায় বাজে বাজে, এখনো বাড়ী ফেরার নাম নেই! বাইরে বেরোলে আমার কথা মনেই থাকেনা মোটে। অভিমানে চোখে জল এল মীনার। পুরুষ মাত্রেই কি এই? বাইরের পৃথিবীর কি এতই আকর্ষণ যে, প্রিয়ার বাহু বন্ধনকেও ভুলিয়ে দেয়?....কাল থেকে তুমি আবার নাম কোরো বাইরে বেরোবার। কাল সকালে একবার বলে দেখো—বাইরে কাজ আছে। আমিও বেরোব। আমি ঘরের মধ্যে এভাবে শুয়ে বসে অপেক্ষা করতে পারবোনা তোমার জন্য।

পথের দিকে জানালাটা খুলে দিয়ে সেখানে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে

বসলো মীনা। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহ-কর্তারা—অফিস থেকে বাড়ী ফিরছে। কারুর হাতে একটা ফুলকপি, কারুর হাতে একটা মাছ, কারুর রুমালে বাঁধা চারটি আলু, কারুর হাতে এক গোছা পান। পদক্ষেপ ক্লান্ত কিন্তু মুখে হাসির রেখা মধুর। প্রিয় পরিজনের সঙ্গে পুর্নমিলনের আশ্বস্তি ফুটে উঠেছে মুখে চোখে। ভারী সুন্দর, ভা—রী সুন্দর। কী হবে টাকা পয়সা—বাড়ী-গাড়ী আর সম্মান প্রতিপত্তিতে? স্বামীর অল্প রোজগার দিয়ে কায়ক্লেশে সংসার চালিয়ে ছেলে পুলে নিয়ে আনন্দময় জীবনযাত্রা। এত ইচ্ছে করে মীনার ওই রকম কোন একটি গৃহস্বামীর ঘরণী হতে।

একটি কাবুলিওয়ালা এই বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। এদিক ওদিক চাইছে। বাড়ীর নম্বরটা দেখবার চেষ্টা করছে। কিছু বুঝতে না পেরে পথ চল্তি একটি লোককে কী যেন জিজ্ঞাসা করলো। তারপর এগিয়ে এসে কলিং বেল টিপলো।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মীনা। কাবলিওয়ালা এ বাড়ীতে কেনরে বাবা? ওরাতো হিং টিং বিক্রী করে বলে শুনেছি। ওপর থেকে ডাকলো—

—বংশীদা! বংশীদা!

—যাই। নীচে থেকে জবাব এলো।

—আসতে হবে না। নীচে দেখতো—একটা লোক বোধ হয় ওঁকে খুঁজছে। কী দরকার জিজ্ঞেস করো।

—আচ্ছা!

মীনা দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। একটু পরেই বংশী ওপরে এসে বললো—বাবুকে খুঁজছে লোকটা। ওর নাম দোস্ত্ মহম্মদ।

—কেন?

—তা কিছু বলছে না। জরুরী দরকার বলছে।

—কালকে সকালে আসতে বলো।

বংশী নীচে নেমে গেল। মীনা গিয়ে আবার চেয়ারে বসলো। কাবলিওলাটা সদর দরজা থেকে রাস্তায় নেমে বাড়ীটাকে ভাল ক'রে একবার দেখে নিলো—তারপরে পথের ডাইনে বাঁয়ে দৃষ্টি মেলে খুব ভাল ক'রে কী যেন দেখলো। কী

বললো যেন নিজে দু'বার তিনবার। অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছে বোঝা গেল। পকেট থেকে ছোট্ট একটি খাতা বার ক'রে কী যেন লিখলো তাতে। তারপর—প্রকাণ্ড লাঠিটাকে সজোরে একবার মাটিতে ঠুকে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মীনার মনের মধ্যে কী রকম যেন ভয় ভয় করছে। কাবলিওয়ালা ওঁকে চাইচে কেন? এতই অদ্ভুত এবং অবাস্তব ওদের দেহের দৈর্ঘ যে হঠাৎ দেখলে মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি বোধ হতে থাকে। বংশী আবার উপরে উঠে এল—

—ও বলে গেল, খুব ভোরেই আসবে, কিন্তু ততক্ষণ যেন বাবুকে আট্‌কে রাখা হয়—নইলে কেলেঙ্কারী হবে।

—কী হবে? চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলো মীনা।

—কেলেঙ্কারী।

—কেলেঙ্কারী মানে?

—তা আমি কী ক'রে বলবো দিদি। যা বলে গেল, তাই বল্‌ছি। এ লোকগুলোতো একদম ভাল নয়। টাকা ধার দেবার সময়—ওরা একেবারে মাটির মানুষ, কিন্তু তার সুদ নেবার সময়—ওরা একবারে চাষার বেহদ্দ।

—কিসের টাকা বংশীদা?

—টাকা না নিলে কাবলিওলা বাড়ীতে আসবে কেন দিদি? হ্যাঁ, আর একটা কথা ও বলে গেল—বাবু আজকে আপিসেও যাননি।

—যাননি?

—না।

ধপ ক'রে চেয়ারটায় আবার বসে পড়লো মীনা। কান্না পাচ্ছে তার, ভীষণ কান্না পাচ্ছে। এসব কী ব্যাপার! সেতো কিছুই বুঝতে পারছে না। অফিসে না যাওয়া, কাবলিওয়ালা—টাকা ধার নেওয়া—এসব কিছুইতো তার মাথায় ঢুকছেনা। ওর কাছে টাকা কেন ধার নেবে কমলেশ? অভাব কি তার? যতদিন থেকে তাদের পরিচয় অন্তরঙ্গতায় পৌছেচে, ততদিন থেকেই তো মীনা তার সব কিছু খরচ বহন করছে। কাপড়-জামা-জুতো-অফিস, বাড়ী ভাড়া—

গাড়ী ভাড়া—যা কিছু লাক্‌শারী সব—সব। তবে আবার কমলেশের এমন কী টাকার দরকার পড়লো, যার জন্ম তাকে—ওই অশ্লীল কাবলিওলার কাছে টাকা ধার করতে হ'ল! না-না-এসব মিথ্যে কথা! নিশ্চয় আর কোন দরকার আছে লোকটার। অন্য কিছু। অথচ অফিসে না গিয়ে আজ সে গেলই বা কোথায়? ড্যালহাউসীতে যখন কমলেশ তার নিজস্ব একটি অফিস ঘরের কথা মীনাকে বলেছিল—তখনই সে আপত্তি করেছিল। মাসে মাসে অতগুলো টাকা ভাড়া দিয়ে কী দরকার একটা স্বতন্ত্র অফিস করার। যদি কোন ব্যবসার জন্ম হতো, তাহ'লেও বা আলাদা কথা ছিল। কিন্তু কেবলমাত্র লেখবার জন্য—

—জনতার মাঝেই নির্জনতা। ওখানে বসে আমার যে লেখা আসবে, তার তুলনা হবে না—তুমি দেখে নিয়ো।

অগত্যা বাধ্য হয়ে সে দু'হাজার টাকা বার ক'বে দিয়েছিল—কমলেশের নিজস্ব অফিস করবার জন্ম।...নিজের মনেই হাসলো মীনা। অফিস হওয়া অবধি একটি লাইন লেখাও লিখতে পারেনি কমলেশ। বললেই বলে তোমাকে ছেড়ে আমার মন এতই দুর্বল হয়ে যায় যে, তখন কোন ভাব মনে আসে না আমার। কাগজ-কলম নিয়ে শুধু বসে ভাবি,—কতক্ষণে পাঁচটা বাজবে, কতক্ষণে তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরবো, কতক্ষণে তোমাকে—!

আশ্চর্য ভীরু আর ভঙ্গুর মানুষ।....যাই হোক, এত দেরী হচ্ছে কেন আজ বাড়ী ফিরতে! কোথায় গেল? এত দেরীতো কোনদিন করে না? আজ হ'ল কী? এমন ধড়ফড় করে বুকের মধ্যে! মনে হয় দরজা জানালা বন্ধ করা ঘরে কেউ যেন তাকে আটকে রেখেছে। ভাল লাগে না। মন বলে, আমি তো সবই ছেড়েছি, সবাইকে ছেড়েছি তোমার জন্ম—তুমি কেন আমাকে একমাত্র ক'রে নিচ্ছো না? কেন—কেবলই মনে হয়, তোমার আরও আকর্ষণ আছে—আমাকে ছাড়া অন্য নারীর কথাও তুমি ভাবো মাঝে মাঝে। অনুদি এলে তুমি অন্যমনস্ক হয়ে যাও—আরতিকে দেখলে তোমার আহার নিদ্রার কথা মনে থাকে না—মিনা, লুসি আর রেবার সাহচর্য পেলে তুমি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠো কেন বলে? এরাতো কেউ আমার চাইতে সুন্দরী নয়। এদের একমাত্র আকর্ষণ—

এরা নতুন। জানি, জানি তুমি নাবিক কলম্বাসের মতো প্রেমিক কলম্বাস, নারীর দেহরূপ দেশ অধিকারের মধ্যে তুমি খুঁজে পাও আবিষ্কারের আনন্দ। আমার দেশে ঘর বেঁধে তুমি চেয়ে থাকো অন্যদেশের দিকে....

চোখে জল এল মীনার। কিন্তু আমি কী করবো? আমি যে তোমাকে ভালবেসে সর্বস্ব দান ক'রে কাঙাল হয়ে বসে আছি! আমার বান্ধবীদের মাঝে তুমি চাও নতুন আস্বাদের আমন্ত্রণ—কিন্তু বন্ধু যে আমার তুমি ছাড়া আর কেউ নেই গো!

আবার যেন কে এসেছে দরজার বাইরে। কলিং বেলের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। বংশীদা দরজা খুলে দিচ্ছে। কারা যেন ঢুকলো বাড়ীতে। ও এল নাকি? নাঃ! জুতোর শব্দতো সেরকম নয়! তাহ'লে?

—মীনা! দরজার বাইরে থেকে আওয়াজ এলো।

ধড়াস ক'রে উঠলো মীনার বুকের মধ্যে। একি! সুমোনদা! এ বাড়ীতে! এমন অসময়ে? ভয়ে—উৎকণ্ঠায়—লজ্জায়, মুখ শুকিয়ে উঠলো মীনার। বুঝতে পারছে না—কিছু বুঝতে পারছে না সে। সুমোনদা—তার এই বাড়ীতে! এযে স্বপ্নেরও অগোচর। কারণ যে ব্যবহার সে ওর সঙ্গে করেছে—তারপর তার এ বাড়ীতে আসাই বিচিত্র যে!···সুমোহনদা তার বাবার নির্বাচিত পাত্র। গত বছর যখন সে আর সুমোহন একসঙ্গে গৌহাটী থেকে কোলকাতায় ফেরে—তখন কত স্বপ্ন দেখেছিল দু'জনে। সে সেই স্বপ্নকে ব্যর্থ করেছে। অপমান করেছে তার পিতার মনোনয়নকে। সুমোহনদা জানে সব কথা। অনুদি তাকে জানিয়েছে মীনার হালচালের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি। তারপরেও কী ক'রে সুমোহনদা—আশ্চর্য!

ধীরপদে সুমোহন ঘরে ঢুকে চুপ ক'রে দাঁড়াল। এগিয়ে গিয়ে মীনা বললো—এসো! ....বসবে না?

—হাঁ, একটুখানি বসতে হবেই।

কেন জানা নেই, অকস্মাৎ মীনা আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠলো। অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলো সে। দৌড়ে বারান্দায় গিয়ে ডাকলো—বংশীদা! বংশীদা!

—যাই ! চিরাচরিত জবাব ভেসে এলো।

—আসতে হবে না। সুমোহনদা এসেছে। যাহোক কিছু খেতে দাও ওঁকে।…এই বলে মীনা হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে দেখতে পেলো সুমোহন স্থির চোখে ঘরের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি লক্ষ্য করছে। তার সামনে আর একটি চেয়ারে বসে পড়ে মীনা বললো—

—ভাল আছো সুমোহন দা !

—আমি মন্দ নেই। শান্ত গলায় বললো সুমোহন।—তুমি—তুমি কেমন আছো ?

—আমি ? মন্দ কী ?

—হুঁ ! শোন, আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ কবতে এসেছি।

—কিসের নিমন্ত্রণ ?

—লাবুর বিয়ে।

—কে লাবু ?

সঙ্গে সঙ্গে অবাক চোখে চাইল সুমোহন মীনার দিকে। কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে থেকে ম্লান বিষণ্ণ হেসে বললো—আমার বোন।

—কবে ? মীনা যেন লাফিয়ে উঠলো।

—পরশু।

—কোথায় বিয়ে হচ্ছে ?

—আগে কোথায় বাড়ী ছিল জানি না। কিন্তু এখন ওরা দিল্লীতে ডোমিসাইল্ড। ছেলেটি ভাল। হঠাৎ ঠিক হ'ল বলে অনেককেই বলা যাবে না হয়তো। দ্বিরাগমনে ওরা ফিরে এলে তাবপরে না হয় কিছু লোকজন বলা যাবে, কি একটু উৎসব করা যাবে। সে যাক। সুমোহন যেন একটু দম নিয়ে বললো, কমলেশবাবু কোথায় ?

এইবার লজ্জা পেলো মীনা। সত্যি লজ্জা পেল, ভয়ানক লজ্জা পেলো। এটা একেবারে অপ্রত্যাশিত। সুমোহনদার মুখে কমলেশের নাম! ছি ছি ছি! শুনিতেই কী রকম খারাপ লাগছে মীনার। তবু—প্রশ্ন যখন হয়েছে, উত্তরও

তখন দিতেই হয় একটা। তাই একটু কিন্তু, একটু কুণ্ঠা জড়িত গলায় বললো মীনা—কী জানি। এখনোতো ফেরেনি অফিস থেকে।

—ও! থাকলে তাঁকেও নিমন্ত্রণ ক'রে যেতাম, এবং তোমাকে পরশুদিন সকালের দিকে বাড়ীতে নিয়ে যাবার অনুমতি নিয়ে রাখতাম।

—অনুমতি আবার কী হবে? আমিতো নিশ্চয় যাবো। খুব ছোট ক'রে বললো মীনা।

আবার চুপচাপ। কথা উভয় পক্ষেরই ফুরিয়ে যাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে।··· মীনার মন বলেছে কী ভদ্র, কী আশ্চর্য রকমের ভদ্র এই মানুষটা। প্রশ্নের মধ্যে কী অসাধারণ সংযম! কিন্তু আরতো চুপ ক'রে থাকা যায় না, কিছু একটা বলা দরকার। এসময় বংশীদাটা যদি চা আর জলখাবার নিয়ে আসতো, তাহ'লেও বাঁচা যেতো; কিন্তু সেও আজ দেরী করছে।

—লাবু, লাবু কেমন আছে? মীনা প্রশ্ন করলো।

—ভালই আছে। আচ্ছা, আমি তাহ'লে আজ উঠি।

—আর একটু বসো! মিনতি—মিনুর কণ্ঠে। একটু চা খেয়ে যাও। বসে পড়লো সুমোহন।

অভিজাত বংশের ছেলে এই সুমোহন। যেমন সুন্দর তার চেহারা, তেমনি প্রখর তার ব্যক্তিত্ব। উচ্চ শিক্ষিত, বিলেত ফেরৎ, দীর্ঘকায় সুমোহন সেনকে দেখলে মানুষ ভয় পায়, কিন্তু মিশলে তার প্রেমে পড়ে।

—তোমার ফ্যাক্টরী চলছে কেমন?

—ভাল। মানে খুব ভাল। এত কাজের প্রেশার—যে শতখানেক লোক একস্ট্রা লাগিয়েও যোগান দিতে পারছিনে। তা'ছাড়া চার পাঁচটা মেশিনও আনিয়েছি এ্যামেরিকা থেকে।

—বেশ। বললো মীনা।— তাহ'লে সময় তোমার বেশ ভালই যাচ্ছে বলো! ঠাট্টা করবার চেষ্টা করলো সে।

—যদি টাকা উপার্জনকেই সময় ভাল যাবার মাপকাঠি বলো, তাহ'লে ভাল যাচ্ছে বইকি!

চাবুক খেলো মীনা। উত্তরটা অপ্রত্যাশিত, কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক নয়। খুব জব্দ হয়েছে মীনা। কোন দরকার ছিল না তার এভাবে গায়ে পড়ে সুমোহনকে ঠাট্টা করার।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ···

বংশীধর চা আর একটা ডিসে চারটি সিঙাড়া, দু'টো সন্দেশ নিয়ে এল। সুমোহন অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে গেছে। কোন কথা না বলে খাবারগুলি সে নিঃশব্দে খেয়ে নিলো। রুমালটি পকেট থেকে বার ক'রে মুছলো নিজের মুখ আর হাত। তারপর আবার চুপ ক'রে বসে রইলো।

কিছু একটা বলবার আছে সুমোহনদার। নিশ্চয় কিছু একটা বলবার আছে। গুম্ গুম্ করছে মীনার বুকের ভেতর ভয়ে। কী কথা বলবে সুমোহনদা। যদি বিয়ের কথা জিজ্ঞাসা করে? তাহ'লে কী বলবে মীনা? কি ক'রে বলবে সুমোহনদাকে যে, বিয়ের কথা বার বার পিছিয়ে যায়, অন্যমনস্ক হয়ে যায় কমলেশ? এইতো পরশু ভোর রাত্রেও ঘুম ভেঙ্গে যখন দু'জনে চুপ ক'রে শুয়ে ছিল তখন আস্তে আস্তে মীনা প্রশ্ন করেছিল—

—এই মাসেও তো বিয়ের একটা ডেট্ আছে।

—হ্যাঁ, তা কী?

—পাঁচজন বন্ধুকে খেতে বলে—একজন পুরোহিত ডেকে—

হঠাৎ পাশ ফিরে নিবিড় চুম্বনে অবরোধ করেছিল মীনার মুখ—কমলেশ। একটু পরে বলেছিল—আমাকে কি তুমি পাওনি ডার্লিং? এতই কেন তোমার ভয়? মন্ত্রের দ্বারা বাঁধা বিবাহটাই বিবাহ, আর প্রেমের দ্বারা বাঁধা বিবাহটা কিছুই নয়?

—না! বোকার মতো উত্তর দিয়েছিল মীনা।—আমি সিঁদুর পরতে পারছিনা যে!

খুব জোরে হেসে উঠেছিল কমলেশ, এই কথায়।

কিন্তু মীনার আশংকাই সত্য হ'ল। একটু পরে সুমোহন বললো—

—বিয়ে করেনি এখনো কমলেশবাবু তোমাকে?

—না। লজ্জিত মুখে বললো মীনা।—আজ কাল আজ কাল ক'রে খালি পিছিয়েই যাচ্ছে ব্যাপারটা।

—সেটা তুমি জোর ক'রে বলো ওঁকে! আমাদের বাংলা দেশে এভাবে নরনারীর থাকাটাকে আত্মীয় স্বজন ভাল চোখে নাও দেখতে পারে।

—তাতো বটেই। ক্ষীণকণ্ঠে মীনার জবাব।

—আচ্ছা, আমি আজ উঠি, কেমন? তাহ'লে পরশু কখন গাড়ী পাঠাব—তোমাকে?

—কখন যাবো তুমি বলো!

—কখন গেলে কমলেশবাবু রাগ করবেন না তাতো আমি জানি না।

হেসে উঠলো মীনা। তুমি যে কমলেশবাবুর ভয়েই সারা হয়ে গেলে সুমোহনদা! কী ব্যাপার?

—না—না—ভয় নয়। বিড় বিড় ক'রে বললো সুমোহন। —তাহ'লেও তিনি যখন গৃহস্বামী। তখন সংসারের সুবিধে অসুবিধের দিকটাও দেখতে হবে তো!

না না, তুমি আর দয়া ক'রে ওসব দেখোনা। সকালেই গাড়ীটা আমাকে পাঠিয়ে দিও।

এই বলে উঠে পড়লো সুমোহন। পেছনে পেছনে চললো মীনা! যেতে যেতে বললো—

—তুমি গাড়ী আনোনি?

—না।···তোমার কাছে আসবো বলে ট্রামেই এসেছি।···আর কোন কথা কেউ বললো না। চুপচাপ সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো দু'জনে। হঠাৎ একটা কথা ভেবে মীনার সমস্ত শরীর থর থর ক'রে শিউরে উঠলো। অস্ফুট গলায় ডাকলো—

—সুমোহনদা!

—উঁ? ফিরে দাঁড়াল সুমোহন।

—আমি যাব না। না, না, আমি যেতে পারবোনা।

—কেন? কী হল আবার?

—না না। চোখে জল দেখা দিয়েছে মীনার। সে ক্রমাগত মাথা নেড়ে বলতে লাগলো। আমি যাবোনা। এতক্ষণ একথা আমার মনেই হয়নি। লাবুকে তুমি বোলোনা আমার কথা। বোলো আমি মরে গেছি!

—মরে গেছি মানে?

—হ্যাঁ, আমি মরে গেছি। আমি বেঁচে নেই। একথা তুমি সকলকে বলে দিও। এই বলে মুখ ফিরিয়ে সেই খানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মীনা কাঁদতে লাগলো। একটা বেহিসেবী—অবাধ্য কান্না—হু হু ক'রে। টপটপ ক'রে দু'চোখ দিয়ে জল পড়ছে আর ক্রমাগত কাপড়ের আঁচল দিয়ে দু'টো চোখ মুছছে। অবাক হ'ল সুমোহন। মীনার এই প্রকৃতি তাব অজানা নয়। তবু আজ এই কান্নার কারণ বুঝতে একটু কষ্ট হচ্ছে বৈকি! একপা একপা ক'রে এগিয়ে গিয়ে মীনার পেছনে দাঁড়িয়ে ডানহাতখানি তার মাথায় রাখলো। হাল্কা অথচ গভীর সুরে ডাকলো—

—মীনু!

—না—না—না। আমায় তোমরা অমন ক'বে ডেকোনা। আমায় আদর কোরোনা। কেন বকছোনা, কেন মারছোনা আমাকে? আমি যে কাজ করেছি, সেটা কি খুব ভাল কাজ? তোমাদের মুখ কি উঁচু হয়েছে তাতে? আবার আমাকে বলছো লাবুর বিয়েতে যেতে? সেখানে যদি মাসীমা আমায় সব কথা জিজ্ঞাসা করেন, কী বলবো আমি? লাবু যদি আমায় কিছু বলে, কী করবো আমি? বলো—কী করবো আমি?

—সত্য যা, তাই বলবে। শান্ত গলায় বললো সুমোহন।

—হ্যাঁ, তাই বলবো। মগের মুল্লুক কিনা এটা!

সদর দরজার গলিটার দেওয়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মীনা কাঁদতেই লাগলো মাথা নীচু ক'রে. অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে থেকে ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস পড়লো সুমোহনের। মাথা থেকে হাতটি নামিয়ে নিয়ে সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে…

অনেকক্ষণ এইভাবে কাঁদবার পর মীনার মনটা অনেকটা হাল্কা হয়ে এলো। উপরে যেতে যেতে তার মনে পড়লো কমলেশতো এখনো বাড়ী আসেনি! সর্বনাশ! ও যদি এই সময় বাড়ী আসতো, তাহ'লে দেখতে পেতো মীনা পথের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে, তাহ'লে কী হতো? জেরার চোটে জেরবার ক'রে দিতো মীনাকে। তারপর যখন শুনতো সুমোহনদা এসেছিল নেমন্তন্ন করতে, তখন থেকে কী যে একটা কাণ্ড বাধতো তাদের জীবনে। আবার মান অভিমান কান্নাকাটি চোখের জল। হয় অনাহার, নয় প্রচণ্ড আদরে সোহাগে শেষ হতো এই পালা।

কিন্তু ধন্য এই সুমোহনদা! একটি বাজে কথা বললোনা, থাকলো না দরকারের বেশী একমিনিট, এমনকি তার যে কান্না দেখলে পাগল হয়ে যায় কমলেশ, যতক্ষণ অবধি না মুখে হাসি ফোটে, ততক্ষণ অবধি মুখে অবিশ্রান্ত চুমো খেয়ে যায়, তার সেই কান্না দেখেও একটু বিচলিত হলোনা সুমোহন। কখন যে নিঃশব্দে চলে গেছে সে, তা' টেরও পেলনা মীনা। অসাধারণ মনের বল।

আয়নার সামনে গিয়ে সান্ধ্য প্রসাধনটা কান্নার জন্যে কোথাও চোট্ খেয়েছে কিনা, পরীক্ষা করতে করতে ভাবলো মীনা:—নারী হচ্ছে লতার মতো। তার যা কিছু প্রাণস্পন্দন, যা কিছু বিহার, যা কিছু বিতরণ, যা কিছু ফুল ফোটানো সবই ওই গাছকে ধরে, তার গুঁড়িকে জড়িয়ে। সুমোহন হচ্ছে সেই পুরুষ জাতীয় গাছ, শক্ত, সমর্থ সতেজ আবেগ বর্জিত আশ্রয়শাখা। কিন্তু কমলেশ তা নয়, লতার চাঞ্চল্যে তারও শাখা হয় আন্দোলিত। কতদিন গেছে মীনার চোখের জল মোছাতে গিয়ে সেও কেঁদে ফেলেছে।..

আবার কলিং বেল বাজছে! আজ ব্যাপার কী? দুনিয়াতে যত লোক আছে সবাই কি আজ তাদের খোঁজ নিয়ে যাবে নাকি? সেই সন্ধ্যে থেকে শুরু হয়েছে লোকের আনাগোনা, তার কি আর কামাই নেই? বা রে বা! আর এ লোকটাও বাড়ী ফেরার নাম করছে না। কী হল, তাই বা কে জানে?

বংশীধর এসে দাঁড়াল। কী বংশীদা?

—একটি মেয়ে এসেছেন সঙ্গে দু'টি ছোট ছেলে।

কী চায়? ভ্রূকুটি ক'রে মীনা জিজ্ঞাসা করলো।

—বাবুকে খুঁজছে।

—বলে দাও, উনি এখনো বাড়ী ফেরেননি।

—বলেছি।

—কী বলে?

—বলছে বড্ড জরুরী দরকার। একবার দেখা না করলেই নয়।

মুখভার ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো মীনা। বড্ড জরুরী দরকার, এই কথাটিই বিরক্তিকর। কেন যে বলে এমন ক'রে লোকগুলো। কোন দরকার, জীবনের কোন দরকারটা জরুরী নয়? নিয়ে এসে বসাও ওই ঘরে। বললো মীনা।

একটু পরেই বংশীর পেছনে পেছনে যে মেয়েটি উঠে এল দু'টি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে, তাকে দেখেই মীনার সমস্ত চিত্ত বিগলিত হয়ে উঠলো। আহা! এযে দারিদ্র্য আর দুর্যোগের প্রতিমূর্তি। মহাযুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত বসুন্ধরার মতো সর্বংসহা মাতৃমূর্তি! কমলেশের অদর্শন এবং নানা পরস্পর-বিরোধী ঘটনার জন্য সমস্ত দিন ধরে মীনার মনের মধ্যে যে একটা বিরক্তির ম্লানিমা লেগেছিল, এই মেয়েটিকে দেখবামাত্র সেটি মুহূর্ত মধ্যে উবে গেল। ছল ছল করতে লাগলো মনের মধ্যে মীনার। তাকে দেখবামাত্র মীনার মনে হল যেন কী একটা অকথিত বিরাট ইতিহাস এই মেয়েটি তার ছোট্ট বুকখানির মধ্যে গোপন ক'রে রেখেছে। কী সেই কথা? কী ইতিহাস? কী কথা?

—বসুন ভাই। বললো মীনা।

মেয়েটি চেয়ে আছে মীনার দিকে। কেমন যেন চোখের দৃষ্টি! যেন জরাজীর্ণ কুঁড়ে ঘরের বাসিন্দা অসহায় চোখে পাটকিলে রঙের ভয়ংকর ঝড়ের মেঘের দিকে চেয়ে আছে। কিন্তু কী অপূর্ব বিরাট চোখ দু'টি ওর! ও যদি কোন দিন বোবা হয়েও যায়, তবু ওর ওই দু'টি চোখ কলস্বরে কথা কইবে। পূরণ ক'রে দেবে ওর সব না বলা কথার অভাব। ভদ্র মহিলা তবু চেয়েই আছেন দেখে আস্তে আস্তে আবার বললো মীনা।

—বসবেন না?

—হ্যাঁ। এই বলে তিনি ছোট একটি নিঃশ্বাস ছেড়ে আরও ছোট ক'রে বললেন—বসতেই হবে একটু আমাকে। মিঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা অনেকদিন আগে থেকেই করছি। কিন্তু ঠিকানাই পাই না। শেষকালে আজকে ঠিকানা পেয়ে—

—ও! ওঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে বুঝি?

মেয়েটি একটু থেমে, একটু ইতঃস্তত ক'রে বললো—হ্যাঁ।

মীনা আর প্রশ্ন করলো না। বুক শেল্‌ফ থেকে একটা বই টেনে নিয়ে সোফার আর একটি কোনে বসে সেটি পড়তে শুরু ক'রে দিলো। পড়তে পড়তে এক সময় মুখ তুলে দেখলো,—ভদ্র মহিলা এক দৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছেন। সেই দৃষ্টির মধ্যে কী ছিল তা বলতে পারবে না মীনা, কিন্তু কৌতূহল যে বেশী ছিলো, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিছু কথা বলবার জন্য মীনা আবার মুখ তুলে মেয়েটিকে বললো—আজকে আসতে বেশী দেরী হচ্ছে। মেয়েটি ঘাড় নেড়ে এই কথার সত্যতা স্বীকার করলো।

ছেলে দু'টি এতক্ষণ চুপ করেই বসেছিল। এইবার বড়টি কথা বললো—"কী সুন্দর আলোয়ানগুলো দেখেছ মা! কী রকম—" হঠাৎ থেমে গেল ছেলেটা।

মীনা বই থেকে মুখ তুলে দেখতে পেলে ছেলে দু'টি ভয়ে ভয়ে মায়ের দিকে চেয়ে আছে। এরা দরিদ্র মীনার মন বললো। গায়ের কাপড় জামা থেকে শুরু ক'রে চাওয়ার ভঙ্গীটা অবধি দরিদ্র। র‍্যাপার খানা এক্ষুনি ওদের দিয়ে দেওয়া উচিৎ। কিন্তু যদি না নেয়। যদি ওই প্রকাণ্ড দু'টো চোখ দিয়ে নিঃশব্দে তিরস্কার করে ওই মেয়েটি? না থাক। কী আশ্চর্য! মেয়েটি কে? কোত্থেকে এলো? কমলেশের সঙ্গেই বা কী সম্পর্ক তার! এতদিন ওরা ঘর বেঁধেছে, কিন্তু একটি দিনও এমন অসম্ভব ঘটনা ঘটেনি!

—আচ্ছা, আপনিইতো মিসেস রায়, না?

—হ্যাঁ। বললো মীনা। তারপর হঠাৎ বইটা মুখ থেকে নামিয়ে চেয়ারে সোজা হয়ে উঠে বসলো—আপনার কী দরকার আমায় বলতে পারেন। যদি আমার দ্বারা সে কাজ হয়, তাহ'লে—

—না। আপনার দ্বারা হবে না।

—কী নাম আপনার ?

—আমার নাম ? আমার নাম উষা। আর এই ছেলে দু'টির নাম আশীষ আর রাতুল। আমরা থাকি কালীঘাটে।

—ও !···কিছু খাবেন ? একটু চা বলে দিই, আর—

ছেলে দু'টি ব্যগ্র চোখে মায়ের দিকে চাইলো। কিন্তু মায়ের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। মীনার চোখে চোখ রেখে নিষ্কম্প গলায় বললো—অনেক ধন্যবাদ। দরকার হবে না কিছু।

—তবে শুধু একটু চা খান ! কেন জানা নেই, মীনার ইচ্ছে করছে ওদের কিছু খাওয়াতে। ছেলে দু'টি দেখতে সুন্দর, ওদের ডেকে আদর করতে ইচ্ছে করছে মীনার। বিশেষ ক'রে ছোট ছেলেটিকে সে যেন কোথায় দেখেছে ! কিছুতেই মনে করতে পারছে না। কিন্তু ওই রকম চোখ, মুখ, নাক, এমনকি হাসির ভঙ্গীটা পর্যন্ত তার চেনা।

—না-না। আপনি এসব সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত ব্যস্ত হবেন না। নবাগতা বললো।

—তাহ'লে আসুন গল্প করি ! মীনা সহজ হবার চেষ্টা করলো। তারপর ছোট ছেলে রাতুলের দিকে চেয়ে বললো—তুমি একটু এসোনা আমার কাছে। কোথায় যে তোমাকে দেখেছি তাতো কিছুতেই আমি মনে করতে পারছিনে। অথচ—তোমার মুখটা আমার ভয়ংকর চেনা।

—তাহতে পারে। মেয়েটির মুখে একটি দুর্জ্ঞেয়, রহস্যময় হাসি ফুটে উঠলো। মিষ্টি অথচ মিস্টিক্। দু'এক সেকেণ্ড মীনার মুখের দিকে চেয়ে থেকে ধীর গলায় বললো—হতে পারে। আশ্চর্য নয়। অনেক সময় খুব কাছের লোককেও চিনতে মানুষের খুব দেরী হয়ে যায়। এমনকি যাকে রোজ দু'বেলা দেখি—তার মুখের আদলও বুঝতে গোলমাল হয়ে যায়। এই বলে সামান্য একটু হেসে কনিষ্ঠ পুত্রের মাথায় ডান হাত রেখে তার দিকে সস্নেহ চোখে চেয়ে বললো—ওর চেহারা হয়েছে, অবিকল ওর বাপের মতো।

—ও ! মীনা বুঝলো—মেয়েটি একেবারে মুখ্যু নয়। দস্তুরমতো লেখাপড়া জানে। কথায় কথায় বললো—

—আপনার স্বামী কী করেন ?

—আমার স্বামী ?

—হ্যাঁ।

—আমার স্বামী যে ঠিক কী করেন—সেটা বলাই তো মুস্কিল। তিনি—। আচ্ছা আপনার স্বামী কী করেন ?

—আমার স্বামী !

—হ্যাঁ। মেয়েটির মুখের কোণে অতি সূক্ষ্ম একটি হাসির রেখা।

—আমার স্বামীতো—(সর্বনাশ ! বাস্তবিক পক্ষে তার স্বামীওতো কিছুই করেনা ! এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলনা মীনা। তবু সে দমবার পাত্রী নয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—বললো) আমার স্বামী সাহিত্যিক, মানে কবি।

—মানে বেকার। পট ক'রে বললো মেয়েটি !—বাংলা দেশের কবি মানেতো বায়ু আহার করেন, আর চটকদার অর্থহীন কথার মালা সাজান ! তাইনা ?

অপমান বোধ করছে মীনা। একি আক্রমণ ? বাংলায় কবি নেই ? কবি কমলেশ রায়ের মতো লেখা কটা কবির কলম দিয়ে বেরোয় ? রচনার ওই গভীরতা, ওই গাম্ভীর্য, ওই সুদূরতা ? ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ নাকি ?

—আপনি কবিতা পড়েন ?

—প্রেমে যখন পড়েছিলাম, তখন পড়েছি। "ম্যানিমিক্ রজনীর রক্তহীন ভূষা, প্রথম প্রেমের মতো প্রাণময়ী উষা।" বুঝতেই পারছেন কবিতাটি প্রত্যূষকে লক্ষ্য ক'রে নেয়—আমাকেই উদ্দেশ ক'রে। অনেকটা—"মূর্তিহীন মীনা"র মতো শুনতে নয় ?

—একি ! আপনি—কী ক'রে জানলেন ?

—জানি বইকি। আমার পর থেকে—যার যার নামে যত কবিতা বেরিয়েছে, সব নামাবলী আমি লক্ষ্য করেছি। লাঙ্গুল হীন শৃগালের গল্প পড়েছেন তো ? আমি চাই সব শেয়ালেরই লেজ কাটা যাক্। এই বলে মেয়েটি যেন কেমন

রহস্যময় কণ্ঠে টুকরো টুকরো হাসি হাসতে লাগলো। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললো—

—রাত্রি ৯টা বেজে গেল। আমাদের আবার এখান থেকে হেঁটে কালীঘাট যেতে হবে। কাজেই স্বামী সন্দর্শন হলোনা।

কী বললেন? তীক্ষ্ণ গলায় বললো মীনা।

—বলেছি, কাজেই আপনার স্বামী সন্দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটলোনা। আজ যাই।

—কিছু বলবো ওঁকে?

—বলবেন—আশীষ আর রাতুলকে নিয়ে উষা এসেছিল কুশল জিজ্ঞাসা করতে।···আচ্ছা, আপনি সিঁদূর পরেননি কেন? বিয়ে হয়নি এখনো বুঝি?

—না না, তা নয়। বিব্রত মীনা জবাব দিলো।—এমনি পরিনি। সব সময় মনে থাকেনা।

—যে বিয়ের পর স্ত্রীর সিঁদূর পরতে মনে থাকে না সে বিয়ে সম্বন্ধেই লোকে সন্দেহ করবে যে!

এই বলে মেয়েটি চলতে লাগলো। সিঁড়িতে পা দেবার পূর্বে মীনা স্পষ্ট দেখতে পেলো—ছোট ছেলেটি—"মা, বাবাতো কই—" বলবার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটি ডান হাত দিয়ে ছেলেটির মুখটা চেপে ধরলো, এবং প্রায় জোর ক'রে তাকে নামিয়ে নিয়ে গেল···

থর থর ক'রে কাঁপছে মীনার শরীর। কী অদ্ভুত রহস্যময়ী এই মেয়েটি, অনেক কথাই ও জানে দেখছি! অনেক কথাই জানে। এমনকি "মূর্তিহীন মীনা" অবধি! কে মেয়েটা? বারান্দা থেকে মীনা ডাকলো—

—বংশীদা! বংশীদা!

—যাই।

বংশী উঠে আসতেই মীনা ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো এই যে মেয়েটি এসেছিল, একে তুমি চেনো বংশীদা?

—নাতো?

—কিন্তু, ওতো আমাদের অনেক কথাই জানে দেখলাম।

—তা জানতে পারে। এই বলে একটু থেমে বংশী যেন নিজের মনেই বলতে বলতে নেমে গেল—আমাদের বাবুর কাণ্ড !···

ঘরে ফিরে এসে মীনা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। ভারী ভয় ভয় করছে মনের মধ্যে। রাত্রি ন'টা বেজে দশ মিনিট হয়ে গেল। তাদের মিলনের পর কোনদিন এতরাত্রি হয়নি কমলেশের বাড়ী ফিরতে। আশ্চর্য! এক একটা দিন আসে যেন দুর্ভোগ আর দুঃসংবাদ নিয়ে। সকাল থেকেই জীবনটা যেন কেমন বাঁকা পথে চলে আর হোঁচট খায়···

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মীনা নিজেকে আবার দেখলো। প্রসাধনটা বেশ খারাপ হয়ে গেছে। যাক্‌গে! বলে সিঁদুর না পরলে লোকে সন্দেহ করবে। কিন্তু সিঁদুর কেনা হয়নি যে! একটু থেমে, একটু ভেবে মীনা লিপ্‌স্টিকটা তুলে নিয়ে আগে সিঁতেয় আঁকলো পরে কপালে দুই ভুরুর মাঝখানে গোল ক'রে আঁকতে লাগলো একটি টকটকে লাল রংয়ের টিপ···

দক্ষিণ দিকের বারান্দা থেকে একটা টিকটিকি ডেকে উঠলো—ঠিক—ঠিক—ঠিক—ঠিক—ঠিক—ঠিক, ঠিক···ঠিক···ঠিক···

চাংওয়ার কাছ বরাবর গাড়ীটা দাঁড় করালো কমলেশ। আলোকমালিনী—কোলকাতা। চাংওয়ার সামনে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে সেই লোকটা ব্যাঞ্জো বাজাচ্ছে। উদ্দেশ্য—মুড্‌ নিয়ে বেরিয়ে আসবার পর যদি কোন সহৃদয় ভদ্রলোক বা মহিলা কিছু অর্থ সাহায্য করেন। কেউ কেউ করেন, অনেকেই করেননা। যাই হোক, তবু বাজনার নেই বিরাম, উদ্যমের নেই অবসান। তবু রাতের পর রাত অবিশ্রান্ত বাজিয়ে চলে এই অন্ধ দরিদ্র শিল্পী।

—কী হল? বললো পার্থ।

—সিগারেট নিই। যেতে যেতে উত্তর দিলো কমলেশ।

সিগারেট কিনে কমলেশ ফিরে দেখলো পার্থ স্টিয়ারিংএ বসে আছে। কমলেশকে দেখে বললো—এবার আমি চালাই, কেমন ?

—চালাও। বলে কমলেশ দরজা খুলে পার্থের পাশে বসে পড়লো।

সোজা সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যু থেকে গাড়ীটা হঠাৎ বাঁয়ে বেঁকলো। কমলেশ অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—আরে ! কোথায় ? কোথায় ? এদিকে কোথায় চলেছিস্ ?

—চলোইনা। শান্ত গলায় বললো পার্থ।

—চলোইনা মানে ? চলোইনা মানে কি ?

—ছি ছি কমলেশদা। তুমি না পুরুষ মানুষ, তুমি না কবি ? তুমি না—যাক্‌গে, চলো। যেখানে নিয়ে যাচ্ছি, সেখানে আনন্দ আর আরাম দুইই পাবে।

—বটে ?

—হ্যাঁ।

—তাহ'লে চলো। কিন্তু বাড়ীতে ভাববে। তা'ছাড়া কালকে প্রিমিয়ারকে রাত্রে খেতে বলেছি !। মেনুটা সম্বন্ধে একটু ভাবা দরকার।

—হয়ে যাবে, হয়ে যাবে।

•

একটি কুখ্যাত পল্লীর দোতালা বাড়ীর সামনে গাড়ী এসে দাঁড়াল। পার্থ গাড়ী থেকে নামলো আগে, পরে নামলো কমলেশ। গাড়ীটাকে ভাল ক'রে লক্ ক'রে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো ওরা। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই একটি ছোট গলি, দু'ধারে বসে আছে পাঁচ সাতটি নারী।

জায়গাটা অন্ধকার। কিন্তু সেই আঁধারে গোল গোল সিগারেটের আগুন দেখে—একথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে—নারীদের মধ্যে কেউ কেউ ধূমপানরতা। পার্থকে উদ্দেশ ক'রে কেউ কেউ বললো—

—ঠাকুরপো, এলে নাকি ?

—হ্যাঁ বৌদি। চলতে চলতে জবাব দেয় পার্থ।

উত্তর দিকের বারান্দার একটি ঘর থেকে সিঙ্গলরীডের হারমোনিয়মের সঙ্গে একটি থন্‌থনে মেয়েলীগলার গান শোনা যাচ্ছে—"আমায় বোলোনা গাহিতে

বোলোনা, আমায় বোলোনা-আ-আ-আ-আ-বোল্…য়োনা।"—উঠোন থেকে ময়লা ও অন্যান্য—আনুসঙ্গিক জমা আবর্জনার ভ্যাপসা গন্ধের সঙ্গে তীব্র আয়ডফর্মের গন্ধ ভেসে আসছে। পূবদিকের বারান্দার একটা ঘর থেকে নারীকণ্ঠের খিল খিল হাসি শোনা গেল। সামনের পর্দা ঠেলে ওরা একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

ঘরের মাঝখানে বিশাল পুরু গদি পাতা। একদিকের দেয়াল ঘেঁষে—একটা ভাল আয়নাওলা আলমারী। অন্যদিকের দেয়ালে, পার্থ ও এই মেয়েটির একটি কম্পোজিট ছবি। ওদের ঘরে ঢুকতে দেখে যে মেয়েটি বসেছিল গদিতে, সে উঠে দাঁড়াল। তারপর যুক্তকরে কমলেশকে নমস্কার ক'রে পার্থকে বললো—

—এই বুঝি তোমার পাঁচটার সময় আসা ?

—আরে ভাই, মাঠে দেরী হয়ে গেল। তারপর পেলাম কমলেশদাকে অনেক দিন পরে। বিখ্যাত কবি, সাংঘাতিক কবিতা লেখেন। প্রণাম করো, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করো।

মেয়েটি এগিয়ে এসে কমলেশের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। কমলেশ বললো—থাক্-থাক্-থাক্! দু'জনে বসলো গদির উপর। মেয়েটি আলমারী খুলে বার করলো একটি পরিপূর্ণ হোয়াইট লেবেলের বোতল, সুদৃশ্য কাচের গ্লাস, আলমারীর পেছন থেকে এক এক ক'রে নিয়ে এলো—দু'টি বায়রনের সোডা।

—খুলে দাও। মেয়েটিকে বললো পার্থ।

—এসব কেন আবার। ক্ষীণ কণ্ঠে বললো কমলেশ।

—কেন! ছেড়ে দিয়েছো নাকি ?

—না ছাড়িনি। তবে—আজকালতো এ সব বাঁধা ধরা ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। স্ট্রীক্ট অর্ডার। তিন পেগের বেশী কিছুতেই খাওয়া চলবেনা। রাজার মেয়ে বিয়ে করা যে ভাই কি জ্বালা, হাড়ে হাড়ে বুঝেছি তা।

—বটেইতো, বটেইতো। সহানুভূতির সুরে বললো পার্থ। তা বৌদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেনা দাদা ?

—কেন দেবনা ? যাস একদিন।

দু'জনে দু'টো পেগ খেয়ে ধাতস্থ হলো। মেয়েটি এতক্ষণ চুপ ক'রে চেয়ে চেয়ে দেখছিল কমলেশকে। এইবার বললো—

—আপনার কোন বই নেই ?

—আছে। 'শিউলী' বলে একখানা কবিতার বই।

—আমায় দেবেন একখানা ?

—*নিশ্চয় নিশ্চয়।*

—ওর নাম স্বপ্না। বললো পার্থ। ভদ্রঘরের মেয়ে। এখানকার কেউ নয়। অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়েছে জীবনে। এই বলে নিজের মনেই হেসে উঠে পার্থ বললে—সে বড় মজার ইতিহাস কমলেশদা! একদিন সন্ধ্যার সময় বাফেতে বসে কফি খাচ্ছি, এমন সময় দেখি, একটু দূরে গংগার একেবারে ধার ঘেঁষে বসে ও একদৃষ্টে জলের দিকে চেয়ে কী যেন ভাবছে।

গেলাসে আর একটা পেগ ঢালতে ঢালতে কমলেশ বললো, তারপর ? তারপর ?

—তারপর দেখলাম, চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে ও উঠে দাঁড়াল, তারপর নীচে জলের দিকে চেয়ে দুলতে লাগলো। আমি বুঝলাম ডিজাস্টার আসন্ন। দৌড়ে গিয়ে ওকে ধরতেই একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়লো।

—আ-চ্ছা !

—নিয়ে এলাম বাড়ীতে। সে অনেক কথা। বাবা মা বিরক্ত হয়ে উঠলেন। বললেন পথ থেকে এই আগুনের টুকরোকে কেন কুড়িয়ে আনলি পার্থ ? এ যে তোর মুখ পোড়াবে। বললাম ন্যাজে বেঁধে যখন এ আগুন আনিনি মা, তখন মুখই বা পুড়বে কেন ? যাইহোক, অবশেষে অনেক ভেবে চিন্তে এখানে এনে রেখেছি। মন্দ কি ? ভালই আছে এখানে !

—সুইসাইড করতে যাচ্ছিলে কেন ভাই ?

—স্বামীর মাতৃভক্তি আর শাশুড়ীর অত্যাচার। কিন্তু এসবই সয়েছিলাম, শুধু যেদিন ওঁরা রাত্রে আমাকে বিষ খাওয়াবার মতলব করলেন, সেই দিনই

সন্ধ্যার সময় বাড়ী থেকে পালিয়ে বাফেতে এলাম। ছাত্রী জীবনে এখানে এসেছি অনেকবার।

—ও!

নেশা একটু পরেই জমে উঠলো। মেয়েটি দেখতে বেশ। লম্বাও নয়, বেঁটেও নয়, মাঝামাঝি গড়ন। নয়ন-লোভন স্বাস্থ্য, নাক-মুখ-চোখ প্রত্যেকটি দেখবার মতো। ঝির ঝির ক'রে একটা ক্ষীণ ঈর্ষার ধারা বইছে কমলেশের মনের মধ্যে। সে মনে মনে তুলনা করবার চেষ্টা করলো, মীনা বেশী সুন্দরী না স্বপ্না বেশী সুন্দরী। শাদা লেবেলের মাহাত্ম্যে স্বপ্নাই উৎরে গেল আজ। কতই আর বয়স হবে? বছর কুড়ি বড় জোর। কমলেশ মনে মনে কবিতা রচনার চেষ্টা করতে লাগল—

কান পেতে শোনো সখি হৃদয়ের ক্রন্দন,
অধরের তীরে হোক্ অধরার বন্ধন।
তনু-তটিনীর তটে
কলঙ্ক যদি রটে
ললাটে তিলক পোরো অনুরাগ-চন্দন
অধরের তীরে তীরে অধরার বন্ধন।

—ইয়াঃ! ইয়াঃ! ইয়াঃ! বিকট চীৎকার ক'রে উঠলো পার্থ! আহা! কী শোনালে গুরুদেব। তনু তটিনীর তটে, কলঙ্ক যদি রটে! রটুক! র—টুকগে কলঙ্ক! থোড়াই কেয়ার করি তাতে। স্বপ্না! প্রণাম করো! পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করো আমার গুরুদেবকে!

—করেছি তো! মৃদু হেসে বললো স্বপ্না!

—ফের করো! কথা কয়োনা! রবীন্দ্রনাথ দেখে গেলেন না,—এই দুঃখ রইল আমার মনে। আহা! আহা! আহা! কী লাইন! ললাটের তীরে তীরে—মলাটের বন্ধন! আহা!

—ধ্যাৎ! বললো কমলেশ। হৃদয়ের তীরে তীরে ললাটের ক্রন্দন! না?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। বললো পার্থ! ললাটের তীরে তীরে ললাটের ক্রন্দন! না?

এতক্ষণে যাকে বলে, নেশাটা বেশ জমে উঠলো। দু'জনেই অনর্গল কথা কইছে, কেউ কারো কথা শুনছেনা। একটু দূরে বসে স্বপ্না হাসছে মৃদু মৃদু।

—গুরুদেব! 'সুদক্ষিণা' আবার কবো। নইলে জগৎ যে গেল! বললো পার্থ। তোমার প্রতিভা, তোমার কাব্য পৃথিবী চাইছে যে।

—দেবো, দেবো। ওবে পার্থ। পৃথিবীকে এই পাপ, এই দুঃখ এই ধনেব ভার থেকে মুক্তি দেবো বলে—সম্ভবামি যুগে যুগে। আমি বিধাতার পাশপোর্ট নিয়ে এসেছি। কিছু ভয় নেই। আমি ত্রাণ করবো।

এই বলে কমলেশ উঠে দাঁড়াতেই পার্থ বললো—বেরিয়ে বাঁ দিকে গেলে কোণের ঘরটাই বাথরুম। যাও! যাও দাদা! মানে গুরুদেব! কমলেশ দরজা দিয়ে যখন বেরিয়ে গেল, তখন দেখা গেল তাব পা টলছে। স্বপ্না এতক্ষণ চেয়েই ছিল কমলেশের দিকে। এইবাব মৃদু হেসে পার্থকে বললো, ইনি তোমার কতদিনের গুরুদেব?

—জন্-জন্মান্তরের। জড়িত গলায় বললো পার্থ।

—কিন্তু উনি মানুষ ভাল নয়।

—এ্যাঁ। চোখ দু'টোকে বড় ক'বে বললো পার্থ। কী ক'রে বুঝলে?

—ওঁর চোখের চাওয়া থেকে।

—ব-বাজে। জিন-ইয়াস-তা জানো? জিনি-ইষাস একটা! আহা! কী কবিতা লেখেগো। "ললাটের হৃদয়ের নিদযের নন্দন।" আহা!

—শুয়ে পড়ো। ভযঙ্কর নেশা হযেছে তোমাব!

—আমার গুড়্দেব?

—গুড়দেবও চিনিদেব হয়ে বাড়ী যান।

—অ-ও। হেসে উঠলো পার্থ। পরিহাঁস করছো? এই বলে খ্যিঃ খ্যিঃ খ্যিঃ খ্যিঃ ক'রে একটা অদ্ভুত হাসি হাসতে লাগলো পার্থ।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে কমলেশের মনে হল আর একটা বিশ্বযুদ্ধ কাল সকালেই আরম্ভ হবে। সে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর নিজেব মনেই মাথা নেড়ে বলতে লাগলো, ভাল করছো না, কাজটা ভাল করছোনা দাদা।

কোরিয়ায় কী কাণ্ডটা করলে বলো দিকিনি! এতগুলো লোক খামোখা মরে গেল···কত লোকের সুন্দরী স্ত্রী যে বিধবা হয়ে গেলো—(তারা আবার বিয়ে করবে নিশ্চয়) আমেরিকার মেয়েগুলো খুব সুন্দরী হয়। রিটা হেওয়ার্থ, আভা গার্ডনার,···বীণা রায়! (সাত তাড়াতাড়ি প্রেমনাথকে বিয়ে ক'রে বসলো! অপেক্ষা করতে জানেনা। ছি ছি ছি।··,আকাশের দিকে চেয়ে কমলেশের মনে হলো কবে যে এরা মঙ্গল গ্রহে যাওয়াটা পারফেক্ট করবে। আচ্ছা, মঙ্গল গ্রহে কি মেয়েছেলে আছে?) মঙ্গলা ছবিটা কী একটা ম্যাড্রাসী ছবি যেন! ভানুমতী বলে মেয়েটা! মেয়ে ছেলে যদি সুন্দরী না হয়—আরে সর্বনাশ! বাড়ী যেতে হবে যে! মীনা! মীনা হয়তো এতক্ষণ কাঁদতে শুরু করেছে।

রেলিং ছেড়ে এগোলো কমলেশ। ডানদিকের একটা ঘরের দরজা খোলাই ছিল। ভেতরে বসেছিল এক ভদ্রলোক। তিনি জামা ছাড়ছিলেন, অর্থাৎ সদ্যই বাইরে থেকে ফিরেছেন। তার মানে নিজস্ব ঘরোয়ানা। চোখ ফিরিয়ে কমলেশকে দেখতে পেয়ে তিনি চীৎকার ক'রে উঠলেন:—

—আরে! কমলেশবাবু যে! দাঁড়ান মশায়, দাঁড়ান।

অস্পষ্ট ঝাপসা—কেমন যেন অন্ধকার···অন্ধকার—সব। দাঁড়াল কমলেশ। কে ডাকছে তাকে? সাহিত্যের ডাক নাম কমলেশ বলে কে ডাকে তাকে? এই অধিকার দেওয়া কি উচিত? তাহ'লে তো যে সে তাকে যা তা বলে ডাকবে! সে নিজের মনেই বার দুই তিন মাথা নাড়লো, তারপর বিড়বিড় ক'রে বললো—

ঠিক নয়। একটা কবিকে মানে একটা প্রতিভাকে—এভাবে নাম ধরে ডাকার কোন রাইট নেই তোমাদের। বুঝেছ?

—আপনি এখানেও আসেন নাকি মশায়? খুব যে! জোচ্চুরীর একবারে পরাকাষ্ঠা—কী বলুন?

—এ্যাঃ? কী বলছোঃ?

—বলছি, রাজা মহারাজা দেখিয়ে এ কারবার কতদিন আরম্ভ হয়েছে! ছত্রিশটা ব্যাঙ্কের চেকের সব কটাই ধাপ্পা?

—ধাপ্পা মানে ?

—ধাপ্পা মানে ঠক্‌বাজী! ব্যাংকে নেই টাকা, এদিকে ফুটানি মেরে চেক দেওয়া আছে!

—তুমি গিয়েছিলে চেক নিয়ে ?

—যাইনি! বললে টাকা নেই।

—ক্রস্‌ড চেক তুমি ভাঙাতে গেলে কী রকম ?

—লোক নিয়ে গিয়েছিলাম। তার এ্যাকাউণ্ট ছিল ওই ব্যাংকে। সে আমায় বলেছিল—যদি এই চেকের টাকা থাকে তবে এইটে আমার নামে জমা দিয়ে আমায় একটা বেয়ারার চেক দিয়ে দেবে।

—ধোয়া কাপড় জামা পরে গিয়েছিলে ?

—কেন পরবো ধোয়া কাপড় হ্যা ? পাওনা টাকা আনতে যাবো, তার মধ্যে ধোয়া ময়লার কী কথা আছে ?

—প্রচ—উর্ আছে! ধোয়া কাপড় জামা পরে, কালকে যেও—টাকা দিয়ে দেবে। ছি-ছি, তুমি আমার চেকের সম্মান নষ্ট করেছো! মাইঃ!—তুমি ওই তেলচিটে কোট গায়ে দিয়ে ব্যাংকে গেছো আমার টাকা নিতে। তোমায় যে দয়োয়ান দিয়ে তাড়িয়ে দেয়নি এই ঢের।

একটু যেন নরম হল জগমোহন। পলকের জন্য তার মনে হল—হতেও পারে বা। কারণ কাউণ্টারের বাবুরা একবার ক'রে তার দিকে চাইছিল আর মুখ টিপে টিপে হাসছিল বটে! হতে পারে।

তবু স্বরে সংশয় মিশিয়ে বললো—এ কথাতো বাপের জন্মে কখনো শুনিনি বাবা! ময়লা কাপড় পরে চেক নিয়ে গেলে—টাকা দেয় না।

—হ্যাঁ। কতটুকু জানো জীবনের ? কী জানো ? ভদ্রলোকের টাকা আনতে ভদ্র হয়ে যেতে হবে, এই হল ব্যাংকের গোপন সারকুলার। ওই জন্যেই দেয়নি। এস তোমায় একখানা ফ্রেশ চেক দিয়ে দিচ্ছি। যত সব উড়ো ঝনঝাট। একখানা চেক ভাঙাবার মুরোদ নেই, তারা চায় টাকা। চললো জগমোহন—কমলেশের পেছনে পেছনে। ঘরে ঢুকে দেখলো কমলেশ, একটা

তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে আছে পার্থ। সামনে চুপ ক'রে তার দিকে চেয়ে স্বপ্না, কিসের যেন প্রতীক্ষারতা। কমলেশকে ঘরে ঢুকতে দেখে—পার্থ তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললো—

—আরে! কী আপদ! জগমোহনবাবু যে! পাচীদির হাত থেকে টপ্ ক'রে বাইরে বেরোলেন কী করে?

—হেঁ হেঁ হেঁ! এই—কমলেশবাবুর সঙ্গে একটুখানি দরকার ছিল—!

—দরকারী কথা বলবার জায়গাটা বার করেছেন—জব্বর বলতেই হবে।

—হেঁ হেঁ। জরুরী কিনা, তাই—

—বাঃ। বহোতাচ্ছা! চালিয়ে যান! কমলেশ ততক্ষণ ব্যাগ থেকে নতুন একটা চেক বই বার ক'রে একখানি চেক লিখে ফেললো। তারপর অত্যন্ত বিরক্তি ভরে পাতাটা ছিঁড়ে জগমোহনকে দিয়ে বললো—

—নিয়ে যান। খবরদার, কাপড় জামা সম্বন্ধে খেয়াল না রাখলে এর পরে কিন্তু কেঁদে খুন হয়ে গেলেও—আমি কিছু করতে পারব না। খুব সাবধান।

—আজ্ঞে না। সে আমি আলপাকার কোট-টোট পরে যাবো। হেঁ হেঁ—সে সব পরলে আর আমায় চেনা যায় না, তা জানেন? কিন্তু স্যার, কিছু নগদ টাকা না হলে—

—নো, নো, নো। যা দিয়েছি—যথেষ্ট। গেট-আউট।

—আচ্ছা, আচ্ছা স্যার। আপনি উত্তেজিত হবেন না। ঝামেলাবাজী করতে আমাদেরও ভাল লাগে না, তবু করতে হয়, কেন না—আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

জগমোহন যেন উড়তে উড়তে গেল। প্রচুর নেশা হয়েছিল পার্থের। সে একটু থেমে বললো—কী হয়েছিলো—গুড়্‌দেব?

কিছুই হয়নি। চ্যারিটি বিগিন্স এ্যাট্ হোম। লোকটার দুঃখ দেখে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সাহায্য করতে আরম্ভ করেছিলাম, এখন সেটা ওর বার্থরাইটে দাঁড়িয়ে গেছে। যাক্‌গে। আমি তাহ'লে—কী বলে গিয়ে—চলি পার্থ?

—আর একটু, এট্টুখানি গুড়্‌দেব। ওগো! আমার গুড়্‌দেবকে একখানা গান শুনিয়ে দাও!

—এখন ! বললো স্বপ্না—কিছু যেন অনিচ্ছার সুরে।

—হ্যাঁ।

—এসেই আগে বললে না কেন তবে ? এখন কি আর গান শোনার মুড্ আছে তোমাদের ?

—শোন—শোন গুড়্দেব স্বপ্নার কথা শোন। কথাবার্তায় কী রকম কালচারের ছাপ এসে গেছে শোন !

—তাই তো দেখছি। খুসী হয়ে বললো কমলেশ।

স্বপ্না ঘরের একটি কোণ থেকে বাক্স খুলে হারমোনিয়াম বার ক'রে নিয়ে এলো। হঠাৎ পাশের ঘর থেকে হেঁড়ে গলার বেসুরো গান ভেসে এল—

—পাঁচী কগো মুসে বাত্তিয়া। আবু হাঁ, পাঁচী কগো সাচি বাত্তিয়া। অসহ্য লাগলো কমলেশের। কোনক্রমেই সহ্য করা যায় না—এই পরিবেশ। কমলেশের জীবন—এখানে বন্দী থাকতে রাজী নয়। সে যাবে উড়ে দেশ থেকে দেশান্তরে, স্বাধীন ভাবে ডানা মেলা পাখীর মতো জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বাধাহীন, বন্ধনহীন ! এই যাত্রাপথে দেখা যাবে কত কলঙ্ক, কত পাঁক, কত কলুষ, কিন্তু সুশুভ্র রাজহংসের পবিত্রতা তার সর্ব অঙ্গে, কোন দাগ থাকবে না তার দেহে বা মনে।

—চললুম গো ! ব্যাগ হাতে নিয়ে বললো কমলেশ।

—আর এট্টু বসবে না—গুড়্দেব ?

—না পার্থ। ওদিকে দু'টি অপলক আঁখি বোধ হয় অনির্বাণ প্রদীপের মতো আমার ফিরে যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে আছে।

—সা—বাস ! শোন শপ্না ! শোন—আমার গুড়দেবের বাণী। সিন্তে পারলো না, সিন্তে পারলো না—বাংলা দেশের লোক তোমাকে। দুরভাগ-অ আমাদের।

—লেট ইট্ গো টু হেল্ ! হোয়াট ডু আই কেয়ার ফর ইয়োর—ব্ল—ব্ল—ব্লেসেড বাংলাদেশের লোক ! বাই—বাই !

টলতে টলতে ঘর থেকে বেরোল কমলেশ। মাথার মধ্যেটা কেমন-

যেন করছে ? মীমাংসার সংগে (এক সংগে আসতে চায় মীনা আর উষা দু'টি শব্দ) মিলিয়ে দেবে, মিশিয়ে দেবে নিজের স্বাতন্ত্র্য বোধ ?—দরকার নেই আর কোন বিবাদ বিসম্বাদের ? তারপর ; তারপরের কথা থাক মহাকালের মনে। আপাততঃ তার আত্মা কেঁদে বলছে—কমলেশ, তোমার বামে ওই উষা দক্ষিণে এই মীনা ; এদের তুমি মিলিয়ে দাও, দূর করো এদের বিভেদ বিচ্ছেদ, মুক্ত করো এদের মোহ কালিমা থেকে।

সিঁড়ির ঠিক পাশের যে ঘরটা, তার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল একটি তন্বী তরুণী। সে কমলেশকে নামতে দেখে হাসিভরা গলায় বললো—

—চললে নাকি ভাই ?

—হ্যাঁ ভাই। ঠাট্টা ক'রে বললো কমলেশ। কিন্তু ঠাট্টা ক'রে বললেও কথার মধ্যে আন্তরিকতার সুরটুকু কমলেশের কান এড়ালো না ! সে সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে গেল। মনে হল কোন আপন জন বোধহয় তাকে ডাকছে ! একবার মনে হল—যাই। আবার মনে হল,— না—না এই অস্পৃশ্য নারকীয়তার মধ্যে না যাওয়াই ভাল।

মনে মনে হাসলো কমলেশ। নীতি বোধ জাগছে। বিচিত্র ! মনে হল দেখাই যাকনা কী বলে ! মেরেও ফেলবে না, কেটেও ফেলবে না—খেয়েও ফেলবে না।

তবে ?

ধীরে ধীরে একপা একপা ক'রে ফিরে এল কমলেশ অপেক্ষমানা মেয়েটির কাছে। ঘরের দরজার ওপরেই দাঁড়িয়ে ছিল সে ! কমলেশকে ফিরে আসতে দেখে সে ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে। পেছনে পেছনে ঢুকলো কমলেশ। এঘরেও তেমনি পুরু গদি মেঝের উপর। মেয়েটি গদিতে উঠে ফিরে চেয়ে বললো—

—বসবেনা ?

আশ্চর্য ! মেয়েদের মুখের এই 'তুমি' ডাক এত মিষ্টি ! মদের নেশা আচ্ছন্ন ক'রে আছে সমস্ত চৈতন্য। তবু তারই মধ্যে মনে করবার চেষ্টা করলো কমলেশ আর কোথায় কবে, কোন যুগে অন্য কোন নারী তাকে ডেকেছে

তুমি বলে। হ্যাঁ। মীনা তাকে তুমি বলে। মীনা। অনেক রাত হয়ে গেছে আর দেরী করা ঠিক নয়। সে হয়তো খায়নি দায়নি অপেক্ষা ক'রে আছে। হয়তো ভাবছে, হয়তো কাঁদছে, হয়তো—। গদি থেকে মেঝেতে পা দিলো কমলেশ।

—চলে যাচ্ছ? আবার সেই স্বপ্নে শোনা কণ্ঠ।

—উঁ? উত্তর দিলো কমলেশ। না, চলে ঠিক যাইনি, তবে যেতে হবে তো? বাড়ীতে হয়তো ভাবছে!

—তোমার বৌ?

চোখ দু'টোকে যথা সম্ভব বিস্ফারিত ক'রে কমলেশ চাইলো মেয়েটির দিকে। তন্বী শ্যামা শিখরী-দশনা পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠি। মধ্যে ক্ষামা চকিত হরিণী প্রেক্ষণাঃ নিম্ননাভিঃ। জ্বালা ধরিয়ে দেয়, আগুন ধরিয়ে দেয় সর্ব দেহে। কমলেশের এবারকার চোখের দৃষ্টি মেয়েটি বুঝলো, এগিয়ে এসে তার ডান হাতটি চেপে ধরে বললো—

—একটু বোসো!

ধপ্‌ ক'রে বসে পড়লো কমলেশ। নিজের মনেই বিড়বিড় ক'রে বললো রাত যে অনেক হয়ে গেছে!

—রাতের ভয়ই যদি করবে, তবে এখানে এলে কেন? এই বলে মেয়েটি দু' হাত দিয়ে কমলেশের গলাটা জড়িয়ে ধরলো। মীনা হচ্ছে পূর্ব জন্মের প্রেয়সী··· নাঃ! মীনা নামটা মনে হচ্ছে আরও আরও আগের। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'জনে পড়তো একসঙ্গে।···মীনা যেন স্বপ্নে শোনা নাম······

কমলেশ কোটের পকেটে হাত দিলো। ঘাবড়াবার কিছু নেই। অনেকগুলো টাকা রয়েছে পকেটে। কতই আর খরচ হবে তার থেকে। একশো? দু'শো? হাজার?

চট ক'রে ঘুম ভেঙ্গে যেতেই বিছানায় উঠে বসলো কমলেশ। ঝাঁঝাঁ করছে মাথার মধ্যে। এ কোথায় শুয়ে আছে সে? এঘর তো তার নিজের ঘর নয়। তবে?

প্রচণ্ড জল তেষ্টা পেয়েছে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। বাঁ দিকে হাত বাড়ালেই মীনার নাগাল পাওয়া যাবে। একটু ঠেলে দিলেই উঠে এক গেলাস জল এগিয়ে ধরবে মুখের কাছে। কিন্তু ঊষা তা নয়, তাকে জল দিতে বললে—সে বলবে—উঠে গড়িয়ে খাওনা লক্ষ্মীটি! দেখছোনা ছেলেটা কী ভাবে ধরে আছে আমাকে! অনেকক্ষণ উত্তর দেয় না কমলেশ। আর একটু পরে ঊষার গলা ভেসে আসে—

—রাগ করলে?

—নাঃ!

—আজকে উঠে জলটা খেয়ে নাও, কাল থেকে আমি জল রেখে দেবো তোমার মাথার কাছে। কিন্তু মীনা আসার পর থেকে ঘুরে গেছে ভাগ্যের চাকা। আদর ক'রে ক'রে আর সেবা ক'রে—তাকে একেবারে নিষ্কর্মা ক'রে ফেলেছে—অলস, উদাস আর সহায়হীন। যাইহোক—আজ যথেষ্ট দেরী হচ্ছে মীনার জল দিতে। ভয়ানক ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো! অতএব নিজেই ওঠা যাক। কতবার ক'রে বলতে হবে? আহা! বড় লোকের মেয়ে! সেবা নিয়েছে চিরকাল, সেবা দেবার অভ্যেস নেই তো!

কমলেশ উঠে বসলো বিছানায়। একি! এতো তার নিজের বাড়ী নয়! এ কোথায় শুয়ে রাত কাটাচ্ছে সে? পাশে এ মেয়েটা কে? এই মেয়েটা? ওঃ—হো—! বিদ্যুদ্বেগে সন্ধ্যা-রাত্রের ঘটনা মনে পড়ে গেল তার। তাকে সিঁড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এসেছিল এই মেয়েটা। সর্বনাশ! মীনা কি ভাবছে এতক্ষণ? মীনা—! সে মেয়েটির গায় হাত দিয়ে ঠেলতে লাগলো—এই শ্যাখো! এই! ওঠোনা একবার!

—এঁ্যা ! চট ক'রে ঘুম ভেঙ্গে মেয়েটি উঠে বসলো। অন্ধকারেই প্রশ্ন করলো—কী বলছোগো ?

—আলোটা জ্বালোনা একবার !

—ভোর হয়নি তো এখনো ! শুয়ে পড়ো !

—ভোর চাইনা, আলো চাই। আলো জ্বালো ! আলো জ্বালো।

খট্ ক'রে শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুতীব্র আলোয় ঘর ভরে গেল। বিছানা থেকে নেমে পড়লো কমলেশ। আলনায় রাখা ছিল কোট, গায় দিলো, তারপর দরজা খুলে পাশের গদিওয়ালা ঘরে বেরিয়ে এল। মেয়েটিও এলো পেছন পেছন। ক্রমাগত মৃদুগলায় বলতে লাগলো—এত রাত্তিরে কোথায় যাচ্ছ তুমি ?

—বাড়ী।

—ভোর বেলায় গেলে হোতো না ! নাইবা গেলে এতরাত্রে। এখানকার পথ ঘাটতো ভাল নয়। অনেকগুলো টাকা তোমার পকেটে। যদি কেড়েকুড়ে নিয়ে নেয়।

—তুমি যা নিয়েছ, তার চাইতে বেশী কিছু নেবে না। কী নাম তোমার ?

—ময়না।

—বা-রে নাম ! ভাবলো কমলেশ ! ফিরে চেয়ে দেখলো আবার সে। সেই তন্বী শ্যামা শিখরীদশনা ! মুখ থেকে ঘুম এখনো তার আলিঙ্গন শিথিল করেনি। ঘোর ঘোর, লাল লাল দু'টো চোখ। ওকে একটু আদর করার লোভ ছাড়তে পারলোনা কমলেশ, বললো—কোথাকার, কার ঘরের ময়না তুমি গো ! এখানকার খাঁচাতেই জন্মেছ, না বাইরে থেকে উড়ে এসে এই খাঁচায় বন্দী হয়েছ ?

—এখানকার নয়, বাইরের। কেন ? বুলি শুনে কিছু মনে হলোনা ?

—মনই ছিলোনা তা' মনে হবে কী।

কমলেশ কোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে চাইলো—ঘরের চারদিকে সামনের দেয়ালে জ্বল্ জ্বল্ করছে একটি রূপবান যুবকের একখানি প্রকাণ্ড তৈল-চিত্র। নিতান্তই অল্প বয়স। চেহারার মধ্যে আভিজাত্য ও বংশ মর্য্যাদা ফুটে বেরুচ্ছে। ছবিখানা এত জীবন্ত যে—মনে হয় চেয়ে আছে। অভিভূতের মতো

ছবিখানার দিকে চেয়ে রইলো কমলেশ। তার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে ময়না ছবিটাকে দেখলো। বললো দেখছো কী?

—লোকটি কে?

—ওইতো আমার মনের মানুষ গো। বিজয়পুরের রাজকুমার।

—বিজয়পুরের রাজকুমার! রাজকুমার ইন্দ্রজিৎ সিং?

মেয়েটি হাসিমুখে ঘাড় নাড়লো। কমলেশ আবার চাইলো মেয়েটির দিকে। বললো—তুমি এখনো ওরই কেয়ারে আছো?

—হ্যাঁ।

—তাহ'লে? এটা কী হল?

—এটা? ঘি ভাতের পাতে একটুখানি আনারসের চাটনি খাওয়া হল!

—তোমাকে এখানে রেখেছে কেন?

—কোথায় রাখবে তবে?

—না-না। আমি বলছি কোন ভদ্র পাড়ায়?

—মানুষ কি তার শোবার ঘরে গরু রাখে? গরুকে গোয়ালেই রাখতে হয়।

—আচ্ছা চলি। বললো কমলেশ। দু'পা বাড়িয়ে আবার ফিরে চাইলে ময়নার দিকে। মীনার চাইতেও সুন্দরী মেয়ে। নিঃসন্দেহ। আচ্ছা, ইন্দ্রজিৎ সিংতো বুড়ো! তবে এ ছবি—

—মা যা ছিলেন। বললো ময়না। মৃদুহাসি তার ঠোঁটের প্রান্তে।—বুঝতে পারলে না? এই ছবি আমার ঘরে না থাকলে আমি তাকে ভুল বুঝতে পারিতো?

—তা বটে। আচ্ছা চলি এবার। হ্যাঁ, কী দিতে হবে তোমাকে?

—আমাকে? কিছুনা।

—সেকি!

—নয়তো কী? রাজা ইন্দ্রজিৎ সিং-এর পোষা ময়নাকে তুমি ছাতুর লোভ দেখাচ্ছো? লাখ টাকার ওপর আমার ব্যাংক-ব্যালান্স। ঘরে হীরে জহরত

যা আছে তারই দামতো প্রায় লাখ টাকা। এছাড়া সোনার গয়নাও প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার আছে? তুমি আমাকে কটা টাকা দেবে গো?

—তাহ'লে এ কাজ তুমি অন্যায় করলে আজ।

—কিছুনা, চুরি করা ফল খেতে মিষ্টি। শব্দ ক'রে হেসে উঠলো ময়না।—আসবে নাকি আর একদিন? আচ্ছা, স্বপ্নার ঘরে তুমি নেশা করলে কেন? ও আর কী খাওয়াবে তোমাকে? আমার ঘরে ফ্রেঞ্চ স্টাফ্ আছে—জানো?

—তাহ'লে নিশ্চয় আসবো।

—এসো।

—রাজা কখন কখন আসেন?

—মাসে দশদিন। বাকী সময় রাজ্যে। পয়লা থেকে দশই অবধি এই বারান্দা দিয়ে মাছি যেতে সাহস পায়না। চারটে গুর্খা ভোজালি নিয়ে ঘুরছে।

—তা' অন্য সময়েই বা গুর্খা থাকবেনা কেন?

—আগে আগে থাকতো। এখন আর প্রয়োজন হয়না। এখন আমি বিশ্বাসের পাত্রী হয়ে গেছি কিনা! আচ্ছা, তোমার তো কোন পরিচয় কিছু দিলেনা!

—আমি কবি!

—আ-হা! "যত ব্যথা পাই, তত গান গাই, গাঁথিযে সুরের মালা। ওগো সুন্দর নয়নে আমার নীল কাজলের জ্বালা?" উঁ? তাহ'লে তো তুমি আবার এলে মালা গেঁথে রাখবো, ফুল তুলে রাখবো—আমি খুব ভাল বীণা বাজাতে পারি, শোনাব তোমাকে।

—অত লোভ দেখিয়োনা। আমি এমনি আসবো।

ডানদিকের দেয়ালে প্রকাণ্ড ঘড়ি টক্ টক্ করছে। সেই দিকে চেয়ে দেখলো কমলেশ, রাত্রি ছু'টো বেজে ২০ মিনিট···

পথ জনশূন্য। দূরে দূরে দু'টি একটি গ্যাসের আলো। একটা অনুচ্চারিত হাহাকারের মতো সমস্ত পথটা এলিয়ে পড়ে আছে। বড় রাস্তার কাছাকাছি

দু'টো কুকুর মারামারি করছে—তারই বিশ্রী বিকটধ্বনি ভেসে এল।…একটা রিক্‌সাওয়ালা ঘুমোচ্ছে—গদিতে মাথা রেখে।

—এই! যাওগে?

—জী! জড়িত গলায় রিক্‌সাওয়ালা উত্তর দিলো।

কী সর্বনাশ! এ ব্যাটাও মদ খেয়েছে নাকি? নাঃ! উঠে বসেছে। গদিটাকে দু'হাত দিয়ে চাপড়ে চাপড়ে ঠিক-ক'রে দিয়ে উঠে দাঁড়াল রিক্সাচালক। উঠে বসলো কমলেশ।

—কীধার যাইয়েগা হুজুর?

—চলো না!

ঠুং ঠুং ঠুং ঠুং শব্দ ক'রে রিক্‌সা চললো।…সেন্ট্রাল এ্যাভিনু আর এই গলিটার সঙ্গম স্থলে একটা বিটের পুলিশ দাঁড়িয়েছিল, সে আড়চোখে একবার চেয়ে দেখলো।

বিজয়পুরের রাজা ইন্দ্রজিৎ সিংএর পোষা ময়না। রূপে আর রূপোতে ডগো-মগো। বুলিদার ময়না। নিজের মনেই হাসলো কমলেশ। সুখ-স্মৃতির অনুভূতি শিহরায় সর্বদেহে। কী অবিশ্বাস্য রকমের নরম দেহ মেয়েটার। হাসেও বেশ। মেয়েদের হাসিতে যাদু আছে। মৃত্যু-নিথর কালো জলের উপর সহস্র দল পদ্মের মতো।…দুর্যোগ ক্ষুব্ধ রাত্রির অবসানে পূর্ব দিগন্তে প্রভাতাভাসের মতো। পঙ্কস্পর্শী পঙ্কজিনী।…মেয়েটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে…বিরক্ত হয়ে পড়েছে…ইন্দ্রজিতের রাজসূয়যজ্ঞে জীবনটাকে আর বলি দিতে চায়না। চায় মুক্তি—চায় গতি, চায়…

ভাল মেয়ে, বেশ মেয়ে। মনে মনে ভাবলো কমলেশ। হঠাৎ তার মনে হল—অনেকক্ষণ তো সে মীনার কথা ভাবেনি। মীনা যেন এতক্ষণ তার চেনা মহলে ছিলোইনা। মীনা—সে যেন কত আগের দেখা একটি সুন্দরী মেয়ে… অল্প অল্প পরিচয় ছিল কমলেশের সঙ্গে…

—বাঁয়ে!

সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যু থেকে বিবেকানন্দ রোড ধরে রিক্‌সা বাঁয়ে বেঁকলো। রিক্সার ঘণ্টার শব্দ বলছে···মীনা-ময়না, ময়না-মীনা ; ময়না-মীনা···ময়না··· ময়না···ময়না···

সেই রাত্রে আরও একজনের চোখে ঘুম ছিলনা। সে তার বসবার ঘরের মাঝখানে সোফায় চুপ ক'রে মাথা নীচু ক'রে বসেছিল। দুশ্চিন্তার দুস্তর তরঙ্গে ডুবছে আর উঠছে তার মন। সে অনুরাধা।

সন্ধ্যার পরেই তার কাছে যে টেলিগ্রাফ এসেছে, তাতেই তার মাথা খারাপ হয়েছে। মীনার বাবা টেলি করেছেন বম্বে থেকে, কাল ভোরে তিনি এসে পৌঁছচ্ছেন দমদম বিমান বন্দরে। ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে আজ আট মাস তিনি ছিলেন কন্টিনেণ্টে। এই আটমাসে যে জঘন্য পরিবর্তন হয়েছে মীনার জীবনে তার বিন্দু বিসর্গও তিনি জানেন না। কিন্তু আরতো গোপন রাখা চলবেনা। আর কী ক'রে এ কথা গোপন রাখা চলে যে মীনা স্বেচ্ছাচারিতার দ্বারা নিজের পথ বেছে নিয়েছে—যাকে বলে বিপথ ? কী ক'রে এ কথা বলা চলবে যে অবিবাহিতা মীনা, আজ স্বতন্ত্র বাড়ীতে তার প্রণয়ীর সঙ্গে বিবাহিত জীবন যাপন করছে ? কী ক'রে বলবে ? কেমন ক'রে বলবে অনুরাধা ?....কী অসহায় অবস্থা ! কান্না পাচ্ছে তার। মনে হচ্ছে এই মাথাটাকে যদি ওই দেয়ালের সঙ্গে ঠকাস্ ঠকাস্ ক'রে ঠোকা যায়, তবে বোধ হয় এই চিন্তার হাত থেকে সে রেহাই পাবে।

অমন মেয়ে। অমন চমৎকার মেয়ে ! লক্ষ পুরুষের কামনার ধন। সে কিনা অত সহজে অত অবলীলাক্রমে কণ্ঠলগ্না হয়ে গেল বাংলা দেশের একজন অখ্যাত অজ্ঞাত আনরিকগ্‌নাইজ্‌ড কবির ? কমলেশ রায় ? ছিঃ ছিঃ ? এর আগে অনায়াসে মীনা সুইসাইড করতে পারতো, তাতে অন্ততঃ খবরের কাগজে ছবিটা ছাপা হতো। ঘটনাটা ? থাকতো রহস্যাচ্ছন্ন, লোকে রোমান্সের গন্ধ খুঁজতো। ছ্যা ছ্যাঃ। শেষকালে কমলেশ রায় ?

কি মীনার বাবা আসছেন আজকে ভোরে। তাঁকে আনতে যেতে হবে দমদম এরোড্রোমে। প্লেন থেকে নেমেই তো তিনি জিজ্ঞাসা করবেন খুকু কই ? কী

বলবে অনুরাধা? প্রথম প্রথম যখন তার কাছে টাকা আসতো তখন সে দ্বিরুক্তি না করে, দ্বিধা না ক'রে তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দিয়েছে মীনাকে। কিন্তু এর পরে অবস্থা যখন খুব ঘোরালো হয়ে উঠলো যেদিন কমলেশকে উপলক্ষ্য ক'রে মীনা তাকে প্রকাশ্যে অপমান করলো, সেদিন থেকে সে সব টাকা তার কাছে গচ্ছিত রেখেছে, এক পয়সাও মীনাকে দেয়নি, আশা ছিল মনে—যেদিন কমলেশের কাছে ধাক্কা খেয়ে মীনা কাঁদতে কাঁদতে তার কাছে ফিরে আসবে, সেদিন সে সব টাকা তাকে ফেরৎ দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে নিজেও কাঁদবে। কত কষ্টের···কত দুঃখের....কত বেদনার বন্ধুত্ব ওদের। মীনাকে সে কম ভালবাসে নাকি! কমলেশ ওকে কী ভাল বাসবে! ভালবাসতে জানে কমলেশ! স্বার্থপর মৌ-লোভী পুরুষ। দু'দিনের জন্য ভাব ক'রে বেচারার দেহটাকে দিল মাটি ক'রে।

কী কথায়—কী কথা এসে পড়েছে! কাল সকালের জন্য কী ব্যবস্থা করা যায়! কী করে মীনার এই কেলেংকারী-টাকে তার বাবার কাছে গোপন কর যায়? মীনাকে উনি যে রকম ভালবাসেন, শুনেই হয়ত ক্রাকৃড হয়ে যাবেন। তখন?

নানাদিক থেকে নানান আঙ্গিকে অনুরাধা এই ঘটনাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো। কিন্তু এমন কোন বুদ্ধি মাথায় আসছে না, যা বলে এই মহাসত্যকে আপাততঃ চাপা দেওয়া যায়। মীনা মরে গেছে বলবে? নাঃ! তা হয় না।

অনুরাধা উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পায়চারী করতে লাগলো। দু'হাত দিয়ে নিজের কপালটাকে টিপে ধরলো, চুলগুলো ধরে টানলো। তারপর আবার পায়চারী করতে লাগলো •••

একটি উপায় আছে। মাত্র একটি উপায়। সে উপায় হচ্ছে সুমোহনবাবুর শরণাপন্ন হওয়া। সুমোহন বাবুকে গিয়ে সব কথা খুলে বলা এবং সাহায্য প্রার্থনা করা। কিন্তু—

এই কিন্তুটাই বিরাট, বিচিত্র এবং জটিল "কিন্তু"। এই একটি মাত্র ছোট্ট 'কিন্তু'র মধ্যে লুকিয়ে আছে বিশ্বসৃষ্টির অপার অনন্ত রহস্য, যার সীমা নেই,

সংখ্যাও নেই। এই একটুখানি 'কিন্তু'র মধ্যে কত মানুষের উত্থান-পতন, কত জন্ম-মৃত্যু, কত মিলন-বিরহ······

সুমোহনবাবু কী-ই বা সাহায্য করবেন এ বিষয়ে। হয়তো বলবেন—মীনার বাবাকে কোলকাতায় অন্যত্র রাখো, এবং বলে দাও যে মীনা চলে গেছে হায়দ্রাবাদে তার এক বান্ধবীর সঙ্গে দেশ দেখতে। কিম্বা—

নাঃ। কোন সুরাহা হচ্ছেনা! রাত্রি বেড়ে যাচ্ছে, আজ রাতেই কিছু একটা সিদ্ধান্তে না এসে পৌঁছান পর্যন্ত শান্তি নেই।

অথচ—আজ কত কথাই মনে পড়ে অনুরাধার। চোখে জল আসতে চায়,—সেই সব পুরোণো স্মৃতির পুনঃস্মরণে। একদিন, তখন নতুন এসেছে মীনা হাস্টেলে। একই ঘরে ছিল দু'জনের সিট্। মীনা এসে আধোরাতে তার পাশে শুয়ে পড়লো

—উঠে এলি যে! বললো অনুরাধা।

—ভাল লাগছে না অনুদি, মার খেতে ইচ্ছে হচ্ছে; খালি মনে হচ্ছে কেউ যদি আমায় বেত দিয়ে সমস্ত শরীরে মারতো, তাহ'লে বোধ হয় ভাল লাগতো আমার।

নারীর মুখে এই কথা মারাত্মক। অদ্ভুত লাগে শুনতে! স্টেকেলের বইয়ে এই রকম কী একটা যৌন-চেতনার কথা পড়েছিল সে। সেইদিনই, কেন জানা নেই—অনুরাধার মনে এই কথাই উদয় হয়েছিল যে—এই মেয়েটার কপালে অত্যন্ত দুঃখ আছে। দৈহিক যন্ত্রণার মধ্যে যে আনন্দের সন্ধান করে, তার দেহ প্রাকৃতিক নিয়মে দানবের কবলিত হবেই। কিন্তু কী বংশের মেয়ে সে! সে কথা একবার ভাবলো না মীনা। একবার চিন্তা ক'রে দেখলোনা যে, তাকে কেন্দ্র ক'রে তার বাবা এবং আত্মীয় স্বজন ভবিষ্যতের যে স্বপ্নের জাল বুনেছে তাকে ছিন্ন করার তার কোন অধিকার নেই। তার বাবা তাকে এখানে পড়তে পাঠিয়েছেন—দয়িত সংগ্রহের জন্য নয়।

আশ্চর্য! একটা অসহ্য অসহায়তার গুমোটে যেন দম বন্ধ হ'য়ে আসচে অনুরাধার। এ কী হ'ল? সকাল বেলায় সে কি ক'রে মুখ দেখাবে মীনার বাবার কাছে? মীনার বাবার এই আকস্মিক আগমন সুসংবাদ না দুঃসংবাদ

বার বার সে কথা নিজেকে প্রশ্ন করলো অনুরাধা। তবু দুর্যোগ-ক্ষুব্ধ রাত্রির পূর্ব দিগন্তে সামান্য একটু শাদা আভাসের মতো কোথায় যেন আজকের এই নিথর নিশ্ছিদ্র পরিবেশের মধ্যেও একটু আশার খবর আছে। সেটুকু কী? কেমন ক'রে সমস্তঃব্যাপারটা একটা সুসমাপ্তি লাভ করবে?

সুমোহনকে বলা দরকার, তার কাছে যাওয়াও উচিত অনুরাধার। এই দুঃসময়ে সেই একমাত্র বন্ধু। শুধু কী বন্ধু? সুমোহন অনেক কিছু। সুমোহন চেয়েছিল—মীনা লেখাপড়া শিখে বিদুষী হ'য়ে তার ঘরে আসুক। বিয়ের পর তার দেহে বা মনে কোনখানে যেন এতটুকু অজ্ঞানতা না থাকে। কিন্তু সইলোনা এত স্বাধীনতা। মীনা ঠিক তার অপব্যবহার ক'রে বসলো।

বাংলা দেশে সুমোহনের মতো ছেলে কটা আছে? যে পুরুষ নিশ্চিন্ত আরামে বাড়ীতে বসে স্ত্রীর অর্থে ভাগ বসায় তাকে মানুষ বলা যায়? কখনো না! তা'ছাড়া মীনাতো ওর স্ত্রী নয়। কোনমতেই না। সে তো আরও খারাপ। স্ত্রী নয় যে মেয়ে, তাকে স্ত্রীত্বের সুগারকোটিং দিয়ে ভুলিয়ে রেখে Exploit করা ছি ছি!

অপদার্থ—ভূত একটা।

সমাধান তো হচ্ছেনা কিছুতেই! সুমোহনকে বলা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। কিন্তু সুমোহন যদি ঘাড়ে না নেয় এই ঝক্কি! যদি সে বলে—"না অনুদি, আমাকে আর এর মধ্যে ডাকবেন না। মীনার জীবন থেকে আমি যখন বাতিল হয়ে গেছি, তখন ওর পরিবারের মধ্যেই বা আমাকে নাক গলাতে বলছেন কেন? আপনি যা ভাল বোঝেন করুনগে।" তাহ'লে? তাহ'লে কী করবে অনুরাধা?

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই কাপড়টা বদলে ফেললো সে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে অন্যমনস্ক ভাবে একবার দেখে নিলো, তারপর—ছোট্ট ব্যাগটা হাতে নিয়ে পথে নেমে পড়লো।

রাত বেশ গভীর। অনুরাধার ট্যাক্সি যখন সুমোহনের বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়াল, সামনের কোলাপসিবল্ গেট তখন বন্ধ হয়ে গেছে। মনের মধ্যে একটা

অপরিসীম অসহায়তা বোধ করলো অনুরাধা। তার মনে হল, তাকে বাইরে রেখে সবাই যেন নিজের নিজের ঘর সামলাবার জন্য দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

কলিং বেল টিপতেই হারু বেয়ারা এসে আলো জ্বেলে অনুরাধাকে দেখতে পেয়ে শশব্যস্তে গেট খুলে দিলো, তারপর পাশের ড্রয়িংরুম খুলে দিয়ে বললো—বসুন! আমি বাবুকে ডেকে দিচ্ছি।

—জেগে আছেন তো?

—হ্যাঁ। বললো হারু বেয়ারা।—বই পড়ছেন।

হারু চলে যেতেই আবার সেই ভাবনার কুয়াশা অনুরাধাকে ছেঁকে ধরলো।··বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলোনা। পরদা ঠেলে সুমোহন ঘরে ঢুকে একটু যেন অবাক হলো অনুরাধাকে দেখে। তবু কণ্ঠকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক ক'রে বললো—

—কি ব্যাপার অনুদি! আপনি এতরাত্রে—

—ভয়ানক জরুরী দরকার!

—আদেশ করুন।

—কালকে ভোরে কাকাবাবু আসছেন কোলকাতায়।

—সে কি!

—হ্যাঁ। উনি কন্টিনেন্টে গিয়েছিলেন নিজের বিজ্‌নেসের ব্যাপারে। সেইজন্য—মাস কয়েক কোন খোঁজ খবর নিতে পারেননি বা টাকাও পাঠাতে পারেননি।

—মীনা টাকা পাচ্ছেনা মাসে মাসে?

—কয়েক মাস থেকে পাচ্ছেনা।

—তাহ'লে? চলছে কী করে ওর?

—তাই বা আমার জানার দরকার কী? যেহেতু যে ভদ্রলোক থাকেন ওর কাছে, তিনি পুরুষমানুষ, এবং পুরুষমানুষ নারীর কাছে থাকলে সংসারের ভাবনা চিন্তা ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপার সেই পুরুষটিকেই ভাবতে হয়—এইটেই

নিয়ম। নইলে সংসারের ভারসাম্য থাকে না। অতএব মীনার কী ক'রে চলছে এ চিন্তা আমি করতে যাবো কেন?

এই বলে একটু দম নিয়ে অনুরাধা আবার বললো—অবিশ্যি পাঠানো বন্ধ করবার আগে লাস্ট দু'তিনমাসের টাকা আমার কাছেই রয়েচে, আমি সেটা দিইনি মীনাকে ইচ্ছে করেই। কেননা একটু ঠেকা দরকার কোথাও।

—তাই বুঝি? হেসে বললো সুমোহন।

—হাসছো? হাসতে পারছো তুমি? জগতের ইতিহাসে কোথাও দেখেছো এত বড় বাঁদরামী? এমন ইতরোমী?

—ভিন্নরুচির্হি লোকঃ। বললো সুমোহন।

—তাই বলে এই রুচি! ওর মত মেয়ের? এই বলে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো অনুরাধা। মনে হল ভিতরে ভিতরে ক্রোধটাকে সে দমন করেছে ক্রমাগত। তারপর হঠাৎ স্বরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললো—মরুকগে, এখন কী করা যায় বলো দিকিনি! কাকাবাবু এসে যদি দেখেন যে তাঁর কন্যা—তাঁর অনুমতির অপেক্ষা না করেই স্বয়ম্বরা হয়েছে—তাহ'লে হার্টফেল করবেনা তাঁর!

—করতে পারে। গভীর গলায় সুমোহন বললো।

—তাহ'লে?

—তাহ'লে আবার কী?

—বা—রে! একটা উপায় তো বাৎলাবে! নইলে এত রাত্রে তোমার কাছে দৌড়ে এলাম কেন?

স্থির চোখে চেয়ে আছে অনুরাধার দিকে সুমোহন। যেন তার মুখে কী একটা লেখা পড়ার চেষ্টা করছে সে। দেয়াল ঘড়ির টক্ টক্ শব্দ শোনা যাচ্ছে···

—অনুদি!

—হ্যাঁ বলো! ব্যগ্রকণ্ঠে বললো অনুরাধা।

—আমায় তুমি এর মধ্যে ডেকোনা। আমায় টেনোনা এর মধ্যে অনুদি!

—টানবোনা! তোমায় টানবোনা মীনার ভাগ্যের মীমাংসা করতে, তবে কাকে ডাকবো শুনি?

—ভাগ্যের মীমাংসা ! ও তুমি একলাই পারবে। (আর কখনো সুমোহন তাকে তুমি সম্বোধন করেছে কিনা, অনুরাধা মনে করতে পারছে না) ওর প্রতি আমার দায়ীত্ব-বোধ নতুন ক'রে জাগবার পথ নেই।

চুপ ক'রে বসে রইল অনুরাধা। একটা অব্যক্ত কান্না গলার কাছে পুঁটলী পাকাচ্ছে। একলা থাকলে নিশ্চয় কেঁদে ফেলতো সে। এত রাত্রে ছুটে আসার এই পরিণাম। অথচ দোষ দেওয়া যাবেনা সুমোহনকে। সত্যি কথা বলতে —সুমোহনের কাছে আসাই উচিত হয়নি তার। কেননা সুমোহনকে অস্বীকার করেছে, অগ্রাহ্য করেছে মীনা। একটা অসীম অসহায়তা।···সব দোষ যেন তার। সব দোষ অনুরাধার। যেন সমস্ত জগৎ তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করবে কাল সকালে। কাকাবাবু হয়তো বলবেন—ও যদি ভুল পথেই যাবে, তবে তুমি এখানে কী করতে ছিলে মা ? জানেন নাতো নিজের মেয়েকে। কথা শোনবার মেয়েই বটে !

সুমোহনের দিকে চাইল অনুরাধা। জল চক্‌চক্ করছে ছ'চোখের কোলে। সুমোহন চেয়ার ছেড়ে নিঃশব্দে উঠে পায়চারী করতে লাগলো ধীরে ধীরে। তারপর এগিয়ে এসে বললো—উনিতো কাল সকালে আসছেন ?

—হ্যাঁ। অনুরাধার গলা ভিজে উঠেছে কান্নায়।

—ব্যবস্থাটাও তাহ'লে কাল সকালেই করা যাবে। রাত্রি জেগে কোন লাভ নেই।

—ভোর ৬-৫০-এ প্লেন।

—বেশতো। বললো সুমোহন। ৫-৪০-এ আমি তোমাকে বাড়ী থেকে তুলে নেবো। কেমন ?

—কাকাবাবুকে কী বলবো, তাহ'লে কী ঠিক হল ?

—কিছুই ঠিক হলনা। তাঁকে রিসিভ করতে যাবো এই ঠিক হল।

—তারপর ?

—তারপর আবার কী ? ক্ষেত্র বুঝে কর্ম করা যাবে।

—বে-শ। অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও উত্তর দিল অনুরাধা। তার স্বভাবটা একটু আলাদা। সব জিনিসই সে রুটিন মাফিক করতে চায়। যে কোন কথা, যে কোন কাজ, যে কোন কর্তব্য সে আগে থেকে ছকে নিয়ে এগোতে ভাল বাসে। তাই সে আজকে রাত্রে ছুটে এসেছিল এখানে—কালকে কাকাবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বা সংবাদ আদান প্রদানের সব ব্যাপারটা শেষ করতে। কিন্তু সুমোহন তা হ'তে দিলেনা, সকালের জন্যে ঝুলিয়ে রাখলো।

চেয়ার ছেড়ে উঠলো অনুরাধা। চাইল সুমোহনের মুখের দিকে। একটু ইতঃস্তত করলো। তারপর বললো—আচ্ছা। এই বলে পথে নেমে গেল। গেট অবধি এলো সুমোহন সঙ্গে সঙ্গে। পেছন থেকে বললো—অতটা ভেবে লাভ নেই অনুদি। মিথ্যে কথাকে রং দিয়ে বলবোনা—এইটেই মাথায় রেখো।

গেট বন্ধ করার শব্দ শোনা গেল···

কিন্তু আজই বিকেলে যে সুমোহন মীনাকে নিমন্ত্রণ করতে তার বাড়ীতে গিয়েছিল, একথা অনুরাধার অজানা রইল।

রাত্রি গভীর

কমলেশের রিক্সা এসে বাড়ীর সামনে দাঁড়াল। ময়না-মীনা শব্দটা ক্ষীণতর হয়েছে মাথার মধ্যে। কেমন যেন ঝিম্‌-ঝিম্‌ করা অনুভূতি। কোথায় যেন যাবার কথা ছিল, কী যেন সব করবার ছিল, কে যেন কী একটা কথা বলবে বলে ছিল, সে সব কিছুই হয়নি। মাঝে থেকে সময়টা বাজে বাজে কেটে গেল।

একটু একটু ভয় ভয় করছে মনের মধ্যে। অবশ্য মীনাকে ভয় করবার কিছু নেই, তবু যেন—! নিজের মনেই হেসে উঠলো কমলেশ। আশ্চর্য! তার নিজের বাড়ী, নিজের ঘর, নিজের প্রিয়া এর মধ্যে ভয় ভক্তির জায়গা নেইতো! দেরী হয়েছে বাড়ী ফিরতে, হ্যাঁ দেরী হয়েছে। করা যাবে কি তার? পুরুষ মানুষ। বহু কাজ করতে হয় তাকে। কত রকমের এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট যে সারতে হ'ল এর মধ্যে তার কি কিছু ঠিক আছে? হুঃ!

—বাবু? বাবুগো!

—কে? নেশায় আরক্ত চোখ ফেরালো কমলেশ। একটা লোক এসে দাঁড়িয়েছে রিক্সার সামনে। খালি গা, খালি পা, হাঁটুর ওপর তোলা ধুতি। (ছেঁড়াই হবে হয়তো)। কী চাই?

—একখানি বস্ত্র।

—বস্ত্র? বস্ত্র কোথায় পাবো? পথ চলতে বস্ত্র? আমি কি কাপড় জামার ফিরিওলা? বস্ত্র?

—বূড়ো বাপ পথের ধারে পড়ে আছে বাবু। গায়ে দেবার একখান বস্ত্র!

—তা রাত্রে কেন?

—দিনে মুখ দেখাতে লজ্জা করে বাবু। অনেকেই চিনে ফেলবে। পূর্ব বঙ্গের অনেক লোকইতো আছে এখানে। তারা জানে যে!

—হুঁ! কমলেশ কোটের পকেটে হাত দিলো। টাকা আছে, দেওয়াও যায়। কিন্তু বস্ত্র চাইছে যে! ধীরে ধীরে গায়ের কোটটি খুলে ফেললো সে। পকেট থেকে বার ক'রে নিলো টাকা পয়সা। তারপর একখানা দশ টাকার নোট রাখলো কোটের একটি পকেটে। তারপর কোটটাকে ছুঁড়ে দিলো লোকটির দিকে। লোকটা কোট হাতে নিয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলো। তার মনে হ'ল এ নিশ্চয় পুলিশের লোক। কোট শুদ্ধ তাকে ধরিয়ে দেবার মতলব। সে প্রায় কেঁদে ফেললো।

—বাবু। আমি আপনার গায়ের কোট চাইনি। আমার অপরাধ হয়ে গেছে বাবু! আমি চলে যাচ্ছি।

—ননসেন্স। বিড় বিড় ক'রে বললো কমলেশ।—খুসী হয়ে দিচ্ছি, নিতে ভয় পাচ্ছো কেন?

—অনেক দাম যে বাবু।

—অল্প দামের জিনিস আজকাল বাজারে আর পাওয়া যায় না, বুঝেছ? যাও।...আমি সম্রাট অশোক। বছরে একবার ক'রে আমার যা আছে আমি

সব দান ক'রে দেবো। ফকীর হয়ে যেতে চাই আমি। তুমি আর টাকা নেবে? একশো, দুশো, হাজার? নেবে?

লোকটি ততক্ষণে কোট নিয়ে অনেকটা দূর চলে গেছে। সেই দিকে চেয়ে বললো—হায়রে! দিতে চাই, নিতে কেহ নাই! নেবারও ক্ষমতা থাকা চাই। দিতে অনেকে পারে, নিতে পারে ক'জন! ধ্যুস্। আহাম্মক কোথাকার! ফুল! ইডিয়ট, বেগার!

দরজায় ধাক্কা দিতেই বংশী এসে দরজা খুলে দিলো। কোট-বিহীন বাবুর দিকে অবাক চোখে চাইতেই কমলেশ বললো, এক ব্যাটাচ্ছেলে ভিখিরী এসে 'জামা নেই' 'জামা নেই' ক'রে ভারী জ্বালাতন করছিল। দিয়ে দিলাম তাকে কোটটা। চল দেখি, ওপরে যাই। মা কোথায়?

—বসেই আছেন এখনো।

—সেকি? বসেই আছেন মানে?

—হ্যাঁ। এতক্ষণ পর্যন্ত বাড়ীতে না এলে বসে থাকবেনাতো করবে কী শুনি? বিরক্তিভরা গলায় বললো বংশীধর?

—যা—যা! ভারী আমার গার্জেন এলেন। বেশ করেছি। আমি কাল থেকে তো আরো রাত্তির ক'রে বাড়ী ফিরবো। আমার ইচ্ছে হয়েছিল তাই—

কমলেশ থামলো হঠাৎ। দেখা গেল সিঁড়ির উপর মীনা দাঁড়িয়ে। দেখলেই বোঝা যায় আজ সমস্তদিন তার ওপর দিয়ে একটা যেন ঝড় বয়ে গেছে। চুলগুলো উস্কো খুস্কো, মুখ শুকনো, চোখ দু'টি ম্লান। সিঁড়িতে দুপা উঠতেই সে নেমে এসে কমলেশের হাত ধরলো। বললো—এসো।

—ছেড়ে দাও! আমি ঠিক আছি। বললো কমলেশ।

—আজ এত রাত হল ফিরতে?

—আরে এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে—। সে এক আচ্ছা জায়গায় গিয়ে পড়েছিলাম। মেয়েটা মন্দ নয়, বুঝেছ? ময়না নাম। সে হাত ধরে টানাটানি। আমিও যাবো না, সেও ছাড়বে না। শেষকালে উপরোধে ঢেঁকি গিলতেই হল।

—বেশ করেছো। তা ময়নার ওখানে বাকী রাতটুকু না কাটিয়ে এই রাত্রি-বেলায়,—এলে কিসে ?

—রিক্সা। জড়িত গলায় উত্তর দিল কমলেশ।

—আর জামা ? কোটটা কী করলে গো ? মীনা বললো।

—একটা ভিখিরীকে দিয়ে দিলাম। এই বলে একটু যেন আত্মপ্রসাদ অনুভব করবার চেষ্টা করলো কমলেশ। মনে মনে যেন বলবার চেষ্টা করলো—এ সব দান আমার জন্মগত। দান করা আমার একটা নেশা। দান করতে আমার ভাল লাগে। আমি সম্রাট অশোক।

—ওপরে এসো। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। এই বলে মীনা কমলেশের হাত ছেড়ে দিয়ে ঘরে চলে গেল। আজ বিকেল থেকে তার শরীর ভাল নেই। কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, ভয় ভয় করছে যেন থেকে থেকে।

অথচ মীনা জানে ভয় পাবার কিছুই নেই। কেবল মাত্র আজকের রাত্রিছাড়া কমলেশের আর কোন দিন দেরী হয়নি এমন। অবশ্য কমলেশের রাত ক'রে বাড়ী ফেরার সঙ্গে যে তার ভয় ভয় করার কোন যোগসূত্র রয়েছে এমন কথা সে বলতে পারে না। তবু মনে হয়—!

ঘরে ঢুকে ধপ্ করে একটা সোফায় বসে পড়লো কমলেশ। কী আশ্চর্য্য সুন্দরী দেখাচ্ছে মীনাকে ! এই রূপের সঙ্গে মিশেছে শিক্ষা দীক্ষা আর সংস্কৃতি। উজ্জলতর হয়েছে রূপের শিখা। এর কাছে ঊষা, এর কাছে ময়না ! ধ্যাৎ ! আচ্ছা, এঘরটা কার ? এই জয়পুরী কাঠের কাজ করা সেণ্টার টেবল তাদের তো ছিল না ! তবে ? রাতারাতি কি মীনা বাসা বদল করলো ? না, না, তাইবা কী করে হবে ? বাসাই যদি বদল হয়ে থাকে, তাহ'লে সেই বাসায় পথ চিনে এলো কী ক'রে কমলেশ ? ভুল হয়েছে তার। এ সেই পুরোণো প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগের নীড়, আদিকালের মানবদম্পতীর জন্য...

মীনা আলমারীর কাছে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে কী যেন করছিল। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে বললো—আজ বিকেল থেকে অনেকগুলো ঘটনা ঘটছে, যা তোমার জানা

দরকার। কিন্তু তুমি যদি এইভাবে ড্রিঙ্ক্ ক'রে বেহেড হয়ে বাড়ী আসো, তাহ'লে তো কোন কিছুই বলা যাবেনা।

—না-না। বললো কমলেশ।—ড্রিঙ্ক ক'রে এলেও ড্রিংক্ করিনি এখনো। তুমি বলো! বিকেল থেকে ঘটনা ঘটছে? কী ঘটনা? কেমন ঘটনা? কোথায় ঘটলো, এবং কেন ঘটলো?

মীনার চোখে বোধ হয় জল এসেছিল। সে এটা বেশ বুঝতে পারছে যে এখন কমলেশের সঙ্গে কথা কওয়াও যা, একটা বোবা পশুর সঙ্গে আলাপ করাও তা। তবু কর্তব্য করতে হবে। উপায় নেই।

—একটা কাবলীওয়ালা এসেছিল।

—কাবলীওয়ালা?

—হ্যাঁ।

—ক্যা—ক্যানো?

—তাতো আমি বলতে পারছিনে। তবে সে লোকটা আমাদের বাড়ীর সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাতা খুলে অনেকক্ষণ ধরে কী যেন দেখলো। তারপর এসে কড়া নাড়লো। বংশী তার সঙ্গে কথা বলেছে। কী বলেছে সে আমি জানিনা, তবে আমায় বংশী এসে জিজ্ঞাসা করলো—বাবু কি কাবলীওলার কাছে টাকা ধার করেছেন?

—ধ্যাস্! ধ্যাস্! কাবলীওলার কাছ থেকে টাকা ধার করবো আমি? কবি কমলেশ? ক্যানো? কী দুঃখে? খেতে পাচ্ছিনে? ছেলের পৈতে? মেয়ের বিয়ে? বাপের শ্রাদ্ধ? তবে কী?...আর অবাক হয়ে যাই, তোমরাই বা এই এ্যাংগল থেকে ভাবো কেন? ...লম্বা লোকটাতো?

—হ্যাঁ।

—হাতে একটা রূপোর ছিট বসানো লম্বা লাঠি ছিল?

—হ্যাঁ খুব লম্বা লাঠি ছিল হাতে।

ইস্তাম্বুলের ইদ্রিস খাঁ। আমি সেই—কী বলে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের "কাবলী-ওয়ালা" গল্পটার ওপর একটা থিসিস লিখবো বলে ঠিক করেছি, না?

—জানিনাতো!

—দেখেছো, মনে নেই। তা সেই থিসিসটা লেখার জন্যে ওই দেশের আচার ব্যবহার—চলন বলন সম্বন্ধে একটু স্টাডি করার দরকার নয় কী? তাই আমার বন্ধু ইদ্রিসকে ডেকেছিলাম একবার আলাপ করবো বলে। এসেছিল তাহ'লে?

—হ্যাঁ।

—ভেরী গুড্‌। কাবলীওয়ালা দেখলেই ভয়ে অস্থির হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। তা'ছাড়া কাবলীওয়ালা মানেই দেনা নয়।

—আমি যা দেখেছি, তাই তোমাকে বলছি। অত জোর দিয়ে কথা বলছো কেন?

—না-না ঠিক আছে। তারপর? ইদ্রিস আবার কবে আসতে পারবে বলে গেছে?

—কালকে খুব ভোরে।

—অ! অস্ফুটে বললো কমলেশ।

—এ ছাড়া আর একটি ভদ্রমহিলা এসেছিলেন দু'টি ছেলে সঙ্গে নিয়ে। অনেকক্ষণ বসেছিলেন তোমার জন্যে। নামটা আমি মনে করতে পারছিনে। বোধ হয় উষা। ছেলে দু'টির নাম আশীষ আর রাতুল।

—এ্যাঃ! কমলেশ খুব সামলেছে।

—তিনি অনেকক্ষণ বসে ছিলেন। মনে হ'ল খুব একটা জরুরী দরকারে তিনি তোমাকে খুঁজছেন। তবে পোষাক পত্তর কাপড় চোপড় দেখে আমার মনে হ'ল ভদ্র মহিলা দুর্ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন।

হঠাৎ সেই প্রায় নির্জন ঘরে হো হো হো হো ক'রে পিশাচের মত হেসে উঠলো কমলেশ। জীবন যুদ্ধে হেরে যাওয়া পরাজিত সৈনিকের হাসির মতো সে হাসিতে যেন লেগে আছে—হেরে যাওয়ার কালিমা। হর্ভ্রতে হাসতে বললো কমলেশ—বহৎ আচ্ছা, তিনিও এসেছিলেন তাহ'লে? তা'—আবার কখন আসবেন বলে গেছেন?

—কালকে ভোরে। হেসে উঠলে কেন অমন ক'রে? কে তিনি?

—এ স্ট্রীট বেগার। কবে কিছু দান করেছিলাম। সেই দানের সূত্র ধরে গ্রহণের অধিকার জন্মে গেছে। এখন আমার কাছে দাবী করা ওর যেন একটা বার্থরাইটে দাঁড়িয়ে গেছে। ভাল। ভাল। তা' ছেলে দু'টি আমায় বাবা বলেনিতো?

—হোয়াট ননসেন্স ইউ আর টকিং! বিরক্ত হয়ে বললো মীনা। স্ট্রীট বেগারের ছেলেদের নিয়ে এ কী ঠাট্টা তোমার? মদের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও হারিয়েছো নাকি?

—বলতে পারে, বলতে পারে। এভরিথিং ইজ পসিবল্ ইন্ দিস্ আর্থ। যদি বলতো—আমি তাদের বাবা, তাহ'লেও আমি আশ্চর্য হতামনা। এই অবধি বলে কমলেশ সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালো। তারপর দ্রুতপদে ঘরময় পায়চারী করতে করতে হঠাৎ এক সময় ফিরে চোখ দু'টি বড় ক'রে মীনার দিকে চেয়ে বলে উঠলো—

—কেন ঢুকতে দাও এই আপদগুলোকে বাড়ীর ভেতর?

—বারে! তারা বাড়ীতে এলে আমি কী করবো?

—কেন আসবে তারা বাড়ীতে! কেন আসবে! চাকর নেই? বংশী কী করছিলো তখন? এই বাড়ীটা কি সমস্ত পৃথিবীর মিলনতীর্থ? বাঙ্গালী উড়িয়া মাদ্রাজী কাবুলী যার ইচ্ছে সেই আসবে? আর যার যা মুখে আসে তাই বলে যাবে? শোন কেন তুমি এ সব কথা? এই রাশি রাশি মিথ্যে কথা শুনে আনন্দ পাও বুঝি?

—আমি কী করেছি? আমায় বকছো কেন তুমি? তারা তোমার কাছে কী পাবে, আমি তার কী জানি?

—কী পাবে মানে?

—মানে তাদের কী দাবী, তা' আমি কী ক'রে বলবো? আমি যদি বলি তুমিই তাদের বাড়ীর ঠিকানা দিয়েছ—তাহ'লে অন্যায় বলা হবে? ঠিকানা পায় কোথায় তারা।

অসহ্য রাগে কমলেশ কটমট ক'রে চেয়ে রইল মীনার রাগরক্ত সুন্দর মুখখানির দিকে। পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—

—চলো, ঘরে চলো! সারাদিন খেটে খুটে এসে—দান করার কথা শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল! চলো, ঘরে চলো। এই বলে ক্রন্দসী মীনার দেহকে জড়িয়ে ধরে শোবার ঘরের দিকে চলে গেল কমলেশ—।

যেতে যেতে মীনার আর একবার মনে পড়লো রাতুলের মুখখানা ঠিক কমলেশর মত দেখতে···

অনেক আদর আর অজস্র চুম্বনে বিপর্যস্ত ক'রে কমলেশ যখন মীনাকে ছেড়ে দিলো, তখন সে বিছানার একপাশে এলিয়ে পড়েছে। ক্লান্ত কমলেশও চোখ বুজে পড়ে রইল। মাথার মধ্যে চিন্তার ঝড় বইছে। কার মুখ দেখে উঠেছে সে আজ! দুঃসংবাদ—দুঃসংবাদ—যেন বন্যার মতো তার ভাগ্যের কূলে আছড়ে পড়েছে। যে দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে, সেইখানেই বিবাদ, সেইখানেই ভয়। কী করা যায়? কী করা যায়? যদি সে বাড়ীতে থাকতো, তবে নিশ্চয়ই এতগুলো দুর্ঘটনা মীনার সামনে এসে হাজির হতে পারতোনা। কিছুতো তার আটকানো যেতো। কিছু পথ থেকে বিদেয় করা যেতো। নিরুপায়তার নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে কমলেশের মন।

আশ্চর্য টেনাসিটি এই কাবলীওলাদের। যাবার পথে তাকে দেখেছি বউবাজার-সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুর মোড়ে। রাত্রে বাড়ী এসে শুনলাম—সে এসে পড়েছে মীনার চোখের সামনে। তবু ভাগ্যি যে মীনা তার সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে কথা কয়নি। তাহ'লেই হয়েছিল আর কি!

সব চাইতে ভয়াবহ ব্যাপার, উষা এসেছিল আশীষ আর রাতুলকে নিয়ে। ওদের একটার চেহারা অবিকল কমলেশের মতো। ভাগ্যি, ওটা স্ট্রাইক্ করেনি মীনাকে! তাহ'লে কী কাণ্ডই না হতো! কেলেংকারীর চূড়োন্ত। যাই হোক, এখন এই সবগুলোকে কী ক'রে ম্যানেজ করা যায়!

পাশ ফিরে আবার মীনাকে জড়িয়ে ধরলো কমলেশ। গত জন্মের হারিয়ে যাওয়া সেই শিউলির গন্ধটা এসে নাকে লাগলো। কী ভালবাসে মীনা তাকে। নিজের প্রিয় সেণ্ট পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে ওর জন্য। এর নাম প্রেম, এর নাম আনুগত্য, এর নাম অনুরক্তি। খুব আলতো ক'রে মীনার কপালে চুমো খেলো কমলেশ।

—সুমোহনদা এসেছিল আজ। খুব আস্তে বললো মীনা।

চমকে উঠলো কমলেশ। মীনা তাহ'লে ঘুমোয়নি। জেগে জেগেই চোখ বুজে পড়ে আছে। নিস্তব্ধ ঘরে যখন চিন্তার টাইফুন বইছে, সেই সময় কোন মানুষের গলা শুনলে ধড়াস ক'রে ওঠে বুকের মধ্যে। নিজেকে সামলে নিয়ে কমলেশ বললো—

—কে এসেছিল?

—সুমোহনদা।

—কে সুমোহ—ও! হ্যাঁ। কী ব্যাপার? হঠাৎ?

—কালকে ওঁর বোন লাবুর বিয়ে। তাই আমাকে যেতে বলতে এসেছিলেন।

—ও!

একটু পরে মীনা আবার বললো—কী করবো? যাবো?

—যদি দরকার মনে করো, যাবে বইকি!

—তুমি না বললে যাই কী ক'রে? মৃদু গলায় বললো মীনা।

—নিজে বিচার ক'রে দেখো, যাওয়াটা তোমার ভাল কী মন্দ। যদি মনে করো তোমার যাওয়া উচিৎ, যাবে। নিশ্চয় যাবে।

মীনা আর কোন কথা বললোনা। চুপ ক'রে পড়ে রইলো।

পার্শ্ব-শায়িতা নারীর এই অঙ্গ সুরভি ধীরে ধীরে পাকে পাকে জড়াতে লাগলো কমলেশকে। পায়ের দিক থেকে একটা উত্তাপ যেন গা বেয়ে উঠছে। মীনার দেহের দিগ্‌দিগন্ত কমলেশের মুখস্থ। সামান্যতম তিলের অবস্থানও তার জানা। কিন্তু আজ যেন তার মীনাকে অত্যন্ত অপরিচিতা বলে মনে হতে লাগলো। মনে হতে লাগলো ওর ওই ক্ষুদ্র ভীরু আর ভঙ্গুর তনুখানিকে আপন

বুকে চেপে নিষ্পিষ্ট ক'রে ফেলতে। মীনা আজ এমনই চোট খেয়েছে যে কমলেশের এই অগ্রসরমান আমন্ত্রণে সে প্রথমে কোন সাড়া দেয়নি; কিন্তু একটু পরেই সে সব ভুলে গেল। ভুলে গেল রাগ দ্বেষ হিংসা বিদ্বেষ। ভুলে গেল একটু আগেই কমলেশ বাড়ী ফিরে তাকে অপমান করেছে। ভুলে গেল কমলেশের কাছে আজ তার অনেক কৈফিয়ৎ চাইবার আছে।...ধীরে ধীরে সে নিজের ডান হাতখানি কমলেশের গলার নীচে চালিয়ে দিলো...

ক্লান্ত মীনা ঘুমিয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে বিছানার উপর উঠে বসলো কমলেশ। মন বলে অদ্য শেষ রজনী? প্রেম বলে না-না-না! বাস্তব জীবনে যে ভুল করেছো, যে ত্রুটি করেছো, করেছ যে অন্যায়, আজ যদি সত্যি প্রায়শ্চিত্ত করবার দিন এসে থাকে, তবে করো সেই প্রায়শ্চিত্ত। স্বীকার করো মীনার কাছে ভুলে ভরা নিজের জীবনের কলংকিত ইতিহাস।

বাথরুমে গিয়ে খুব ভাল ক'রে ঘাড়ে মাথায় জল দিলো কমলেশ। কাল সকালে দোস্ত্ মহম্মদ আসবে। আসবে উষা, আশীষ আর রাতুল। তাদের মুখে সব কথা শুনবে মীনা। তারপর ছাদের উপর থেকে লাফিয়ে পড়বে নীচে না আফিং আনিয়ে খাবে, না কী যে করবে, তা ঠিক নেই। হয়তো এত জোরে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠবে যে, পাড়ার লোকজন জড়ো হয়ে কমলেশকে উত্তম মধ্যম দিয়ে দেবে।

তবে?

শোবার ঘরে ঢুকলো কমলেশ। রাত্রি শেষ হতে আর ঘণ্টা দুয়েক বাকী। এরই মধ্যে ঠিক ক'রে নিতে হবে তার কর্তব্য। "এসেছে আদেশ, বন্দরের কাল হ'ল শেষ।" জীবন তরণী এই ঘাটে যখন ভিড়েছিল, তখন তরী ছিল জীর্ণ, পাল ছিল ছেঁড়া, আর হাল ছিল ভাঙা। তারপর এই ঘাটেই মেরামত হয়ে গেছে তার পুরানত্ব। আজ নবীন উদ্যমে যাত্রা করা যায়, যদি এই পিছুটান, এই বেদনাময় পরিস্থিতি না থাকতো।

কাছে তার কিছু টাকা আছে। একার পক্ষে ভাল টাকাই বলতে হবে।

তবু আরো কিছু, বেশী কিছু, অতিরিক্ত কিছু সঞ্চয় থাকলে ভাল হয়। অজানায় ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে জানা থেকে রসদ সংগ্রহ করাই হচ্ছে নিয়ম।

আস্তে আস্তে পাশের ঘরে—যেখানে মীনা করে প্রসাধন আর বেশ পরিবর্তন সেখানে গিয়ে ঢুকলো কমলেশ। মীনার পাশ থেকে উঠে আসার সময় চাবিটা হাত করেই এসেছিল কমলেশ। চাবি দিয়ে খুলে ফেললো মীনার আয়রন সেফ্। ডালাটা টেনে খুলতেই ঝক্ ঝক্ ক'রে উঠলো তার অলংকারের বর্ণচ্ছটা! হাত দিয়ে সেগুলি নাড়াচাড়া করতে লাগলো কমলেশ। ডানদিকের কোণে আর একটা খোপ, তার ভেতরে একদিকে একখানা পাঁচ টাকার নোট, আর একদিকে দশটাকার পনেরোখানা নোট বাণ্ডিল ক'রে বাঁধা। কাগজের গায়ে লেখা আছে আমার জন্মদিনে মায়ের আশীর্বাদ। কমলেশ কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে নোটগুলো দেখে নিতে লাগলো...। প্রথম নোটখানির বাঁ দিকে খুব ছোট ছোট ক'রে লেখা আছে "যদি কোনদিন ভাগ্য দোষে আমি খুব দরিদ্রও হয়ে যাই, তবুও যেন এই টাকা আমি খরচ না করি। এই দুর্মতি যেন আমার কোনদিন না হয়।"

বাজে সেন্টিমেণ্ট। একান্ত মেয়েলি। এই কথায় কান দিলে জীবনে পদে পদে ঠকতে হবে। পুরুষের মেয়েলী কথায় কান দিতে নেই। পুরুষের যাত্রা-পথ বন্ধুর, দুর্গম, কণ্টকাকীর্ণ, মেয়েদের চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ। পুরুষের হাত ধরে সে অবলীলাক্রমে দুর্গম গিরি কান্তার মরু পার হয়ে যায়।

কিন্তু মাত্র এই কটা টাকা? আর কিছু নেই? এত অল্প থাকলে তো চলবে না। আরও চাই, অনেক চাই, অ-নেক—অনেক কিছু চাই যে! কোথায় যাত্রা, কতদূরে তার নতুন লক্ষ্যস্থল, তার তো কিছুই এখনো ঠিক নেই। তার আগে প্রস্তুত হয়ে নেওয়া ভাল নয় কী?

এবার কমলেশ চাইলো গয়নাগুলির দিকে। বহুমূল্য অলংকার, তার ভেতরে হীরে আছে, মুক্তাও আছে। এগুলো খুব কম টাকার নয়। বড়লোকের মেয়ের গর্বের ধন। এ ধন হরণ করতে সুখ আছে, আছে একটা অননুভূত আনন্দ।

অতএব—

একটি রুমালের মধ্যে সব কটি গয়নাকে বেঁধে নিলো কমলেশ। টাকাগুলো থাক বাইরে। তা-মোটমাট টাকা মন্দ হয়নি। অন্ততঃ যা হয়েছে তাতে বেশ কিছুদিন চলে যাবার কথা।

ধীরে ধীরে মীনার খাটের কাছে এসে দাঁড়াল কমলেশ। দুগ্ধ-শুভ্র বিছানার উপর নারীদেহের সুবঙ্কিম রেখা আলস্যে এলায়িত। আহা! বেচারা! কমলেশকে ভালবেসে, তাকে যথাসর্বস্ব দিয়ে, তনুমনপ্রাণ নিবেদন ক'রে পরম নির্ভয়ে নিদ্রামগ্না। ওর এই বিশ্বাসটুকু ভেঙে দিতে ইচ্ছে করছে না কমলেশের। কিন্তু কোন উপায় নেই। আজ এখান থেকে চলে না গেলে কাল সকালে যে মহা সর্বনাশের মুখোমুখি হতে হবে, তাতে তার ধ্বংশ অনিবার্য। বহু স্বপ্ন দিয়ে, কত সাধ দিয়ে গড়া এই নীড় অপ্রত্যাশিতের ঝড়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কোন রকমেই, কোন কৌশলেই—তাকে অটুট রাখা যাবে না। তখন এই মীনাই হয়তো তাকে তার মরাল গ্রীবা বাঁকিয়ে সুতীক্ষ্ণকণ্ঠে বলবে—কেন তুমি একথা আমায় আগে বলোনি, ট্রেটার কোথাকার! কেন বলোনি যে আশীষ আর রাতুল নামে তোমার দু'টি ছেলে আছে। কেন বলোনি যে তুমি কাবুলিওয়ালার চড়া সুদে টাকা ধার নিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ? কেন? কেন? কেন বলোনি? আমি কি তোমাকে দিইনি আমার কুমারী মনের প্রেম? বিনা সর্তে? বিনা সুদে?

আর সব সহ্য হবে, কিন্তু মীনার বড়ো কথা সহ্য হবে না। যাকে ভালবাসি তার চোখ রাঙানোর মতো অশ্লীল জিনিস দুনিয়ায় দু'টো নেই। এর উত্তর দেবার জন্য দু'টিমাত্র পথ আছে। এক হচ্ছে তাকে চাবকে পিঠের চামড়া তুলে দেওয়া—আর একটি হচ্ছে তাকে সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ করা। কমলেশ কবি, ইনটেলিজেন্সিয়া—তারপক্ষে দ্বিতীয় পন্থাই প্রকৃষ্ট।

অনেক আনন্দ দিয়েছে ঘুমন্ত নারীর ওই তনুদেহখানি। আজ তাকে ছেড়ে যেতে মন টন টন করে বৈকি! কিন্তু উপায় কী? ধীরে ধীরে কমলেশ জামা গায়ে দিলো, আর একটি কোট পরলো। ছোট চামড়ার সুটকেশটায় নিজের জামা কাপড়গুলো সব ভরে রাখলো, তারপর সুটকেশটা হাতে নিয়ে দরজার

কাছ থেকে আবার ফিরে চাইলো মীনার দিকে। মানুষের জীবনের দুর্লভ পাওয়া—পেয়েছিল সে। কিন্তু সইলো না।

আশ্চর্য! নিজের কানকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না কমলেশ। উষা। উষা কি ক'রে তার এই ঠিকানা পেয়ে হাজির হলো! কী ক'রে সে জানতে পারলো যে কমলেশ এইখানে তার নতুন স্ত্রী নিয়ে বাস করে? তা ছাড়া যদিই বা সে এলো—তবে নিজের পরিচয়ই বা দিয়ে গেলনা কেন মীনার কাছে! প্রতিহিংসা নেবার এতবড় লোভ সে কী ক'রে সামলালো? সে তো ইচ্ছে করলেই পারতো—তাসের ঘরের মতো ভেঙে ফেলতে এই সংসারখানিকে। তার ওপর তো অবিচার কম করা হয়নি।

এখন মনে হচ্ছে—তাই মীনা আজ কমলেশ বাড়ী আসামাত্র তার মুখের দিকে অমন ক'রে চেয়েছিল! যখন সে বললে—উষা বলে একটি মেয়ে এসেছিল—দু'টি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে, তখন যেন মীনা—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কমলেশের মুখের মধ্যে কী খুঁজছিল!

রাত্রি ভোর হয়ে আসছে। আর ঘণ্টাখানেক পরেই বংশী উঠে কৃষ্ণের শত নাম পড়তে শুরু করবে। জুতোর শব্দ হলে নিশ্চয় বুঝতে পারবে। যাবার আগে যাবে নাকি ওর মুনির মনলোভা ওই ঠোঁট দু'খানির উপর আলতো ক'রে একটা চুমু খেয়ে। নিজের অজান্তেই মীনার দিকে দু'পা এগিয়ে গেল কমলেশ। পরক্ষণেই মনে হল, যদি জেগে যায়। নাঃ! থাক!

বিদায়, প্রেয়সী বিদায়! "দিয়েছো যা পেয়েছি তাই বেশী।" তোমার দানের মধুস্মৃতি রইলো আমার মজ্জায় মজ্জায় জড়ানো। কিন্তু "তবু হায় যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।"

নিস্তব্ধ রাত্রিশেষের অন্ধকার—চেনা সিঁড়ি দিয়ে তর্ তর্ ক'রে নেমে গেল কমলেশ, চিন্তা করলো না, পিছু ফিরে চাইলো না, মীনার অজ্ঞানতার পথ চেয়ে যে পথিক এসেছিল—মীনার মোহ-ঘুমের খিড়কী দোর দিয়ে সেই পথিক বেরিয়ে গেল—পা টিপে টিপে……

ভোর হয়ে এলো...

ঘুমের মধ্যে কিসের একটা অজানা ধাক্কায় জেগে গেল অনুরাধা। পাশের টিপয়ে টিক্ টিক্ করছে টাইমপিস্...৫টা বাজতে ২০ মিনিট বাকী। আর কি ঘুমোনো উচিত? একটু পরেই হয়তো সুমোহনের গাড়ী হর্ণ দেবে।

জীবন কেন এমন? কেন জীবনের রথ মন-নগরীর সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যু দিয়ে চলেনা? কেন এমন ভাবে পথ হারিয়ে সে ছুটে ছুটে মরে এগলি থেকে ওগলি? প্রেমের সৃষ্টিই হয়েছে মেয়েরা তা ব্যবহার করবে বলে। পুরুষ প্রেমের ব্যবহার জানেনা। নারীর হাতে পড়ে যে প্রেম হয় ফুলের মালা, পুরুষের হাতে গিয়ে সে প্রেম হয় বন্দুকের গুলি। মীনা সে হিসেবে অন্যায় কিছু করেনি—কিন্তু সে পাত্র নির্বাচনে ভুল করেছে। কমলেশ কবি হতে পারে, ভাল কবিই না হয় হলো, কিন্তু তাই বলে সে সাংসারিক জীবনে একটি নারীকে নিয়ে যে ছন্দ রচনা করতে পারবে, তার কী মানে আছে?

অবশ্য...কমলেশ পর্বে মীনার সঙ্গে দেখা করেনি অনুরাধা। জানেনা সে ভাল আছে না মন্দ আছে। কিন্তু এই ঘটনাটা যদি সে কাকাবাবুকে জানিয়ে ঘটাতো, তাহ'লেই তো চুকে যেতো সব ল্যাঠা। অনুরাধাকে ভেবে মরতে হতোনাতো!

এই যে সংকট—ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় চাপবে—এতো মীনার স্বেচ্ছাকৃত। এর জন্য দায়ী মীনা নিজে। সে জানেনা—সুমোহন কী ভেবে রেখেছে—কাকাবাবুকে বলবার জন্য। কিন্তু তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী পুরুষ। অনুরাধার মুখের দিকে চাইলেই তিনি বুঝতে পারবেন—হুজ্ হু ইন দ্য ল্যাণ্ড অব ডেনমার্ক্! তখন? এটা ঢাকতে গিয়ে ওটা বেরিয়ে পড়বে, ওটা ঢাকতে বেরোবে এটা। একটা মহা গোলমেলে অবস্থায় পড়বে অনুরাধা। শেষকালে কোন মুহূর্তে ফস্ ক'রে বেরিয়ে যাবে সত্যি কথা, ব্যস। একেবারে সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়াবে ওরা। তারপর? কাকাবাবুর অর্থাৎ মীনার বাবার রুদ্রমূর্তি দেখবার সুযোগ দু'একবার ঘটেছে অনুরাধার কপালে, ওরে বাপ্‌স!

সেবার পূজোর ছুটিতে সে আর মীনা গিয়েছিল গৌহাটিতে। কাকাবাবু সেদিন সকালে তার পাইপটা পরিষ্কার ক'রে রাখতে বিষণা চাকরকে বলে যান। বেলা ১১টায় বাড়ী ফিরে দেখলেন পাইপ পরিষ্কার করা হয়নি। ডাকলেন বিষণাকে, কোন জবাবদিহি শোনবার পূর্বে তাকে মারলেন এক লাথি, সে একবারে ছিট্‌কে গিয়ে পড়লো দোতলা থেকে একতলায় কাছারী বাড়ীর মাঠে। হৈ চৈ রব উঠলো। সবাই মিলে ধরাধরি ক'রে নিয়ে গেল বিষণাকে হাসপাতালে। কাকাবাবু ডেকে পাঠালেন বিষণার বৌকে। তার হাতে একটি হাজার টাকা দিয়ে বললেন—বিষণা সেরে উঠলে তাকে হাসপাতাল থেকে বাড়ী নিয়ে যাস। আমার এখানে আসার আর দরকার নেই। বিষণাকে মারার জন্য তার বৌয়ের যতনা লেগেছিল, তার চাইতে বেশী লাগল এই চাকুরী যাওয়ার কথা শুনে। সে কর্তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো—কিন্তু কিছুতেই কিছু হলনা।

সেই বাপ মীনার বাবা। হয়তো এরোড্রাম থেকেই এই কথা শুনে মুখ ঘুরিয়ে বাড়ী যাবার প্লেন ধরবেন, জীবনে আর কোলকাতা মুখো হবেন না কোন দিন....

নাঃ! আর শুয়ে থাকা নয়। এবার ওঠা যাক্। অন্য দিন তবু ওঠবার সময় কিছুক্ষণ ভগবানের নাম করে অনুরাধা, আজ তা ভুলে গেল......

ঘুমের মধ্যে পাশ বালিশটাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে মীনা আর বলছে আমার ওপর রাগ কোরো না তুমি! আমি যদি কোন দোষ ক'রে থাকি, তবে আমায় তা বুঝিয়ে দিও, আমি আর কখনও সে কাজ করবো না। কিন্তু আমার কাজের জন্য আমাকে তিরস্কার না ক'রে, আমাকে ত্যাগ না ক'রে, আমাকে ভাল ক'রে, মিষ্টি ক'রে বুঝিয়ে দিও, তাহ'লেই তুমি দেখে নিও, আমি আর কখনো সে ভুল করবো না। না, আর কখনও সে ভুল করবো না।

আমি কী করবো বলো? যে কাবলীওয়ালা এসেছিল, তার মুখ, চোখ আর লাঠি ঠোকা দেখে মনে হল, সে তোমার উপর ভয়ানক রেগে গেছে। অথচ সে যদি তোমার গল্পের খোরাক যোগাতেই এসে থাকে, তাহ'লে তার ওই ক্রোধের তো কোন মানে হয় না।...তারপর যিনি এসেছিলেন তাঁকে দেখে আমার মনে

হয়েছিল তিনি তোমার আত্মীয়া। সব চাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার তাঁর ছোট ছেলেটির চেহারা অবিকল তোমার মতো। হ্যাঁ গো! সত্যি বলছি, হুবহু তোমার মতো দেখতে। এমন কি তার হাসিটা অবধি তোমাকে মনে করিয়ে দেয়।···এমন ইচ্ছে করছিল ছেলেটাকে বুকে টেনে নিয়ে আদর করতে···। কিন্তু পাছে ওর মা মনে কিছু ভাবেন, তাই···। এমন আভিজাত্য ভদ্র মহিলার মুখে! বোঝা গেল দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করছেন, কিন্তু সম্মান দিয়ে নয় জীবন দিয়ে।

আচ্ছা, তুমি ও কথা বললে কেন আমায়? ছেলে দু'টো তোমাকে তাদের বাবা বলেনি! ছি ছি! আমি সে রকম কোন ইঙ্গিত করেছি? আমার শিক্ষা দীক্ষা কালচার সবই কি এর মধ্যে আমি অতল জলে ভাসিয়ে দিয়েছি? তুমি কবি, তোমার মুখে কি ওই ভাসা মানায়?

আমায় আর বকোনা, জানি, আমায় বকোনা তুমি।

ঘুমের ঘোরে ডান হাত দিয়ে কমলেশের মাথাটা খুঁজতে গিয়ে মীনার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে চোখ খুলেই দেখলো, ভোরের শ্লেটরঙ্গা আলো জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকছে। আজ এত ভোরে উঠে গেলো কোথায়? বাথরুমে? মীনা উঠে বসলো বিছানায়। ঘরে আলো জ্বলছে, অথচ বাথরুমের দরজাও খোলা। একি! গেল কোথায় লোকটা? তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলো মীনা কমলেশকে। এ'কি হল? জামা কাপড় কিছুই নেই যে! আয়রণ সেফ্ খোলা. কেন? দৌড়ে গেল মীনা আয়রণ সেফের কাছে। থর থর ক'রে কাঁপছে হাত পা। একটানে খুলে ফেললো আলমারীর একটা পাল্লা। বিদ্যুদ্বেগে খুললো তার গয়না রাখা ড্রয়ারের ডালা। অপার শূন্যতার মধ্যে দিয়ে মীনা যেন উড়ে চলেছে। স্বপ্নে উড়ে যাওয়ার মতো।

কী হল? একী হল? কোথায় গেল কমলেশ! তার মায়ের দেওয়া আশীর্বাদের টাকা, তার বাবার দেওয়া দামী গয়না সব নিয়ে গেল কমলেশ। একেবারে পথের ভিখিরী ক'রে দিয়ে গেল তাকে! কিন্তু সে তো তার কোন ক্ষতি করেনি! তবে কেন এই বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষত!

কিন্তু কী করবে এখন মীনা ? কোথায় যাবে ? কার কাছে যাবে ? এই নিবেদিত আর ভুক্ত দেহের কে দেবে মূল্য ? এই উচ্ছিষ্টমন নিয়ে এবার আর কার কাছে সে অঞ্জলি পেতে দাঁড়াবে ? না না তা' হয় না। হয় না তা'। তবে কী হয় ? কী হয় তবে ? কী হলে ভাল হয় ?

টলতে টলতে মীনা এসে আবার শুয়ে পড়লো বিছানায়। কান্না…কান্না… আর কান্না। ভাগ্য দেবতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রচণ্ড মার খেয়েছে মীনা। চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে সে। "নরের মাথায় শ্রমের পসরা নারীর তনুতে কামনা। প্রেম বলে চলো অমরার পানে, প্রয়োজন বলে নামোনা।" হঠাৎ মনে পড়লো মীনার। এর মধ্যে তাহ'লে সত্যবস্তু কিছু ছিলনা ? ছিল শুধু বস্তুতান্ত্রিকতা ? শুধু দেহবাদ ? শুধু—!

পেটের মধ্যে কী রকম যেন একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। কেমন যেন একটা ঘুরপাক্ খাওয়া ব্যথা সোজা বুকের মাঝখান দিয়ে ওপরে উঠতে চাইছে। এরই পাশাপাশি, এই অনুভূতির ধার দিয়ে দিয়ে অনেকদিন আগের শোনা একটা গান মনে পড়ছে "আমার একূল গেল, ওকূল গেল, দুকূল গেল প্রাণ সজনী"। মীনারও আজ ঠিক সেই অবস্থা নয় কী ? সুমোহনদার দরজা চিরদিনের জন্য বন্ধ, অনুদি আর মুখ দেখবেনা বলে গেছে। বাবার কানেও কি এ্যাদ্দিন যায়নি কথাটা ? টাকা পাঠানো বন্ধ করা থেকেই তো অনুমান ক'রে নিতে কষ্ট হবে না যে বাবার এই নীরবতার কারণ কী ?

অথচ—দর দর ধারে আবার জল পড়তে লাগলো মীনার চোখ দিয়ে। অথচ—আমি কোন দোষ করিনি তোমার কাছে। ভালবেসে ধরা দিয়েছিলাম, ভালবেসেই ধরে রেখেছিলাম। আমি তন্ময় হয়ে তফাত হয়ে গিয়েছিলাম তোমার প্রেমে। ইতিমধ্যে কবে যে আমাকে তোমার পুরাতনী বলে মনে হয়েছে, কবে যে মিলনের জোয়ারের তলে তলে শুরু হয়েছে বিরহের ভাটার টান, আমি তো তা' টেরই পাইনি। পেলে আজ হয়তো এত কাদা দেখতে পাওয়া যেতোনা। জল এত ঘোলা হতো না।

আচ্ছা, আমার কি কোন অপরাধ ? দোষ কি আমার ? নাঃ! আমি

তো ওর কথার উপর কোন মন্তব্য অবধি করিনি। তবে? তবে আমার কী? আমাকে আর তোমার ভাল লাগছে না?

কিন্তু—কিন্তু আমার যে তোমাকে ভাল লেগেছিল! আমি যে সমাজ সংসারের অনুশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তোমাকে নিয়ে ঘর করতে এগিয়ে এসেছিলাম। আমি যে—!

ছি, ছি, ছি! তুমি চুরি ক'রে পালিয়ে গেলে! তুমি চোর? নিজের হাতকে চুরি করতে দেখলে আমি যে পরিমাণ অবাক হতাম—তোমাকে তাই করতে দেখে—জান তুমি—আমি কতখানি শক্‌ড হয়েছি? আমি—

এখন যদি আমি বলি—যে তুমি এই ভাবেই মেয়েদের ঠকিয়ে বেড়াও, তাহ'লে অন্যায় বলবো? যদি বলি ওই ছেলে দু'টি তোমারই তাহ'লে মিথ্যে কথা বলবো? যদি আমি আজ বলি যে তুমি ইচ্ছে ক'রে শুধু মজা দেখার জন্য—একটি নারীর মান, সম্মান আর ইজ্জত নিয়ে খেলা করেছো, তাহ'লে কি সেই কথা শুনে ব্যথা লাগবে তোমার?

জয় হোক জীবন দেবতার। যিনি যুগযুগ ধরে কোল পেতে বসে আছেন জগতের সব ঝরাপাতা আর ব্যর্থ প্রেমের মূল্য দেবার জন্য—আমার এই প্রেম নিবেদন করলাম তাঁর পায়ে। আমার চোখের জল ঝরে ঝরে তোমার উত্তপ্ত যাত্রা পথ শীতল হোক। যা নিয়ে গর্ব করতে পারি—এমন অবশেষ তুমি কিছুই রেখে যাওনি। ভাল হোক তোমার। সুখী হও তুমি।

বিছানায় শুয়ে কমলেশের মাথার বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো মীনা। সে কান্নার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, নেই সান্ত্বনা……

দুঃখের মুহূর্তে স্মৃতি জেগে ওঠে। তখন মনে পড়ে ফেলে আসা দিনগুলির কথা। ভুলে যাওয়া বাল্যের সহস্র ঘটনার রোমন্থন চলে। জ্ঞান হওয়া অবধি তার মনে পড়ে দল বেঁধে স্কুলে যাওয়া। আর একটু বড় হলে ন'টায় আসতো স্কুলের গাড়ী, কত মেয়ে থাকতো সেই বাসে। রমা, রেবা, উমা, হেনা, মীনাক্ষী, অতিয়া, উষা চালিহা বলে একটি অসমীয়া মেয়েও থাকতো তাদের সঙ্গে। ভারী

সুন্দরী ছিল সে। শুনেছে মীনা, তার নাকি বিয়ে হয়ে গেছে কোন 'আই, সি, এস' এর সঙ্গে।

অদ্ভুত লাগে। কেন এমন হয়ে গেল জীবন। কোন্ নিষ্ঠুর ভাগ্য দেবতার বিধান এ? তার ভাগ্যে কেন ঘটলো এই অভাবনীয় পরিবর্তন? ছেলে বেলায় মনে মনে কতদিন ভেবেছে সে, পরম রূপবান একটি মানুষ আসবে তার বর হয়ে, যেমন এসেছিলেন ছোট মাসীমার। আঁচলে গিঁট বেঁধে সে নিয়ে যাবে তাকে, —কোন দূরান্তের—পৃথিবীর আর একটি কোণের অন্য একটি নীড়ে। নতুন পরিবেশ, নতুন জগৎ, নতুন লোকজন, যেখানে প্রবেশ ক'রে অধিকার পেতে হলে মনকেও বোধহয় নতুন ক'রে তৈরী ক'রে নিতে হবে। তাতে কোন দুঃখ নেই। কেননা মেয়েদের জীবনই তো নদীর মতো।

একদিন—

গাড়ীতে উঠেছে মীনা, আরতি তার সঙ্গে। উঠেই দেখলো উষা চালিহার চোখ দু'টি লাল। স্কুলের গাড়ীতে ওঠবার পূর্বমুহূর্ত অবধি সে যে ভয়ানক কেঁদেছে —তাকে দেখলেই সে কথা বুঝতে পারা যায়।

—কী হয়েছে উষা? প্রশ্ন করলো মীনা।

উষা তার বড় বড় চোখ দু'টি মীনার মুখের উপর রাখলো। কোন কথা বলবার পূর্বেই আবার তার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ ক'রে জল পড়তে শুরু হলো। অনেক্ষণ চেষ্টার পর সে যা বললো তাতে বোঝা গেল আগামী বুধবার তার বিয়ে। বরের বাড়ী কোলকাতায়, সেখানে এম-এ পড়ে। এই কথা শুনে মীনারও সেদিন চোখে জল এসেছিল। কেন জানা নেই, সেদিন মীনারও মনে হয়েছিল এই একই দুর্গতি তার কপালেও লেখা আছে।

বিয়ের দিন সহপাঠিনীরা গেল বিয়ে বাড়ীতে। কাঁদতে কাঁদতে উষা এল বিয়ের সভায়, কাঁদতে কাঁদতেই হয়ে গেল বিয়ে। বাসরে মীনাকে একান্তে কাছে টেনে নিয়ে কান্নাজড়ানো গলায় বললো উষা—

—এক মাসের মধ্যেই আমি মরে যাব দেখিস্। তাই শুনে মীনাও কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী চলে এল।

খুব দেখলো মীনা।

এর দু'বছর পরে। মীনা ম্যাট্রিক দেবার জন্য তৈরী হচ্চে। হঠাৎ একটি বান্ধবী খবর দিয়ে গেল কোলকাতা থেকে উষা এসেছে। খবর শুনে দৌড়তে দৌড়তে মীনা গেল সেখানে। গিয়ে যা দেখলো—তাতে তার নিজের চোখের দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ হবারই কথা। উষাকে মোটে চেনাই যায় না। দেখতে হয়ে গেছে ইয়া-মোটা। আরও ফর্সা, আরও সুন্দর হয়েছে দেখতে। মাথায়ও বড় হয়েছে অনেকটা।

—কীরে! কেমন আছিস্ উষা? মীনা বললো।

—কোনরকমে কেটে যাচ্ছে ভাই। আসা কি যায় সহজে? ওঁর আবার নতুন চাকরি তো। উঠেই ঠাকুরকে তাগাদা দিতে হয় উনুন ধরাতে। ছ'টা থেকে তার পেছনে লাগলে তবে যদি ন'টায় মাছের ঝোল ভাত রেডি হয়। এমন হয়েছে জ্বালা। উড়ে ঠাকুরতো!

—ও! মীনার মুখে কথা নেই। অপার বিস্ময়।

—তা'ছাড়া আমাদের বালীগঞ্জের বাড়ীটা এমন নিরিবিলি যে হুট্ ক'রে সব জিনিস পাওয়া যায় না। তাই এক সঙ্গে সব জিনিস কিনে রাখতে হয়।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। এই অবধি বলে হঠাৎ উষা যেন সচকিত হয়ে বললো—একটু বোস্ ভাই। আমি দেখে আসি—মানু উঠেছে কিনা।

—কে মানু?

—আমার ছেলে। এই বলে উষা চলে গেল।

মীনার পক্ষাঘাত হয়েছে। নিজের মনের মধ্যে কেমন যেন একটা লজ্জা লজ্জা অনুভব করছে সে। উষার বাচ্চা হয়েছে। কী আশ্চর্য! মা হ'য়ে গেল উষা? মা—? অথচ এই উষাই বিয়ের দিন তাকে বলেছিল মাস খানেকের মধ্যে আমি মরে যাব? এই কি মরে যাওয়ার সাক্ষী? মধুর মরণ!

বাড়ী ফিরে আসতে আসতে সেদিন মনে মনে মীনা জ্বলে উঠেছিল। নারী

হয়ে জন্মেছি বলেকি, পুরুষকে ভালবাসতেই হবে? করতেই হবে বিয়ে? বাঁধতেই হবে ঘর? কিসের এই বাধ্য বাধকতা? গভর্ণমেণ্টের কোন আইন আছে নাকি? নারীকে পুরুষের অধীন থাকতে হবে এ নিয়ম মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে চলিত ছিল। আজ? আজও কি সেই পথেই চলবে নারীর জীবন? রাবিশ!

ঊষা ছিল মাস কয়েক। কিছুদিন পরে এল তার স্বামী। কোন কোন দিন তাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে ওরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে বেড়াতে যেতো, সেই সময় ছাদের উপর থেকে মীনা অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছে ওদের পারস্পারিক সম্প্রীতি প্রাণোচ্ছলতা আর পারিপার্শ্বিক বিস্মৃতি······

কিন্তু আজ?

আজ মীনা কী বলবে তার সহপাঠিণীদের, যদি তারা আজ জিজ্ঞাসা করে তাকে যে, ঊষার বেলায় তোমার তো কলকণ্ঠ শুনেছি, এবার তোমার বেলায় কী হল,—সে কথা বলো! কোন্ অপরিমেয় পৌরুষের অনমনীয় আকর্ষণে তোমার নারীত্বের দম্ভ চূর্ণ বিচূর্ণ হল, বলো সে কথা?

ওঃ! অহংকারই ছিল মীনার। বড়লোকের মেয়ে বলে বান্ধবীরা তাকে ঈর্ষা করতো, কিন্তু কী ধার ধারে সে ঈর্ষার! সেবার পিকনিক করতে গিয়ে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল তার এক সহপাঠিণীর সঙ্গে, নাম তার মিতা। ক্লাস নাইন অবধি এক সঙ্গে পড়েছে সে মীনার সঙ্গে। দু'জনে বসে কিছুক্ষণ ছাড়া ছাড়া কথা হল। তার সঙ্গে ছিল একটি যুবক। মিতা বললো, ও আমার মাসতুতোভাই অনিমেষ। কিন্তু মীনা ওদের চাওয়া আর কথা বলার ধরন দেখে বুঝে নিয়েছিল আসল ব্যাপারটা। একটু পরে মিতা উঠে দাঁড়িয়ে বললো—যাইরে মীনু!

ওদের পিকনিকের মাঠের একটুখানি দূর দিয়ে চলে যাচ্ছিল একটী লোক, হাতে তার দু'টি কেয়াফুল। অসময়ের কেয়া। পুষ্পজাতির ওপর মীনার পক্ষপাতিত্ব। কেয়া দেখে সে লাফিয়ে উঠে ডাকলো লোকটাকে। বললো—কত দাম তোমার এ দু'টী ফুলের?

—এক টাকা দিদিমনি। লোকটি ভয়ে ভয়ে বললো।

—বেশ। দিচ্ছি এক টাকা।

এই বলে মীনা তার ছোট্ট ব্যাগটি খুলে যেই টাকাটা বার করতে গেছে, অমনি মিতা বলে উঠলো—

আমি দু'টাকা দিচ্ছি, ফুল দু'টো আমায় দাও।

ধাঁ ক'রে মীনার রক্ত গেল মাথায় চড়ে। সে অবাক হয়ে মিতার দিকে চাইতেই মিতা বললো—

—অনিমেষদা ফুল ভালবাসে কিনা, তাই এ ফুল দু'টো আমিই নিচ্ছি।

—না। মীনার মুখ থেকে ভদ্রতার স্নিগ্ধতা মুছে গেছে। আমার অবিশ্যি অনিমেষ দা নেই, কিন্তু ফুল আমি নিজেই ভালবাসি—এবং আমিই কিনবো। যেহেতু আমি আগে একে ডেকেছি। আমি তিন টাকা দেবো। দাও।

—আমি দশ টাকা দিচ্ছি। মিতা মুচকি হেসে বললো।

ধাঁ ক'রে আগুন জ্বলে উঠলো মীনার মাথায়।

সে শক্ত চোখে মিতার দিকে চেয়ে বললো, তুমি এটা নিতে পারবে না।

বাধাই বা কী? মিতার ঠোঁটে সেই রহস্যময় হাসি। সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে তার সঙ্গে তার বন্ধু রয়েছে, সেখানে সে ছোট হতে রাজী নয়। আড় চোখে অনিমেষের দিকে একবার চাইলে। সেখানে পেলো নীরব সমর্থন। ফলে দ্বিগুণবেগে কেয়া কেনার উৎসাহে সে মেতে উঠলো। মীনার চোখ এড়ায়নি ব্যাপারটা।

—পনেরো টাকা। মীনা বললো।

-- কুড়িটাকা।

—একশো টাকা দেবো। মীনা চেঁচিয়ে উঠলো। থর থর ক'রে কাঁপছে তার সমস্ত শরীর। একটা লোফার বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসে মিতা তাকে চায় অপমান করতে? মতলব কী তার?

—আমিও দেব একশো দশ টাকা।

—দু'শো টাকা। দু'শো টাকা দেব। উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠলো মীনা। রাগে আর অপমানের জ্বালায় মিতার চোখে জল এসে গেছে ততক্ষণ। সে স্থির চোখে চেয়ে রইল মীনার দিকে পুরো এক মিনিট, তারপর আস্তে আস্তে অনিমেষের হাত ধরে সেখান থেকে সরে গেল।

কিন্তু মিতার চাইতেও খারাপ অবস্থা হয়েছে—কেয়াফুল বিক্রেতার। সে ভয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে শুরু করেছে। মীনা তার কাছ থেকে ফুল দু'টো নিয়ে বললো—তুমি একটু দাঁড়াও। আমি এনে দিচ্ছি তোমায় দু'শো টাকা।

টাকা নিয়ে মীনা ফিরে এসে দেখলো ফুলের মালিক সেখানে নেই। সে পয়সার মায়া ত্যাগ ক'রে সেখান থেকে সরে পড়েছে। জীবনে সে অনেক আশ্চর্য ঘটনা দেখেছে। লটারীর টাকায় লোক রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেছে—তাও দেখেছে। কিন্তু কেয়াফুলের দু'শো টাকা দাম হয়—এ সে বাবার জন্মে দেখেনি। এ মেয়ে যে টাকা দিয়ে পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেবেনা,—এই ভেবে বোধহয় সে পালিয়ে বেঁচেছে।

—রাগ উবে গিয়ে মীনার মন একটা অপার করুণায় ছল ছল করতে লাগলো·········

সেই মীনা।

সেই অসহ্য আত্মসম্মান বোধ ছিল যার, ছিল যার পৈতৃক কুলশীলের গর্ব, ছিল শিক্ষার আস্ফালন আর রূপের গর্ব, সে আজ ধূলোর সঙ্গে ধূলো হয়ে কোথায় মিশিয়ে গেল। নির্বিষ সাপের মতো মার খেয়ে আজ সে মাথা লুকোচ্ছে কেন ?

এখনতো মনের মধ্যে আসছে বিচার। কী ছিল কমলেশের ? কী দেখে সে নিজের যথাসর্বস্ব অঞ্জলীভরে নিবেদন করলো তার পায়ে। দু'লাইন কবিতা ? আচম্‌কা ভাল লাগা কবিতার ওপর নির্ভর ক'রে কবিকে আপন ক'রে নেওয়া কি ঠিক হয়েছিল ? ঠিক যে হয়নি, এওতো প্রতিপদে তার প্রমান !

প্রথম প্রেম। নারীর কত সাধনার, কত আরাধনার, কত ধ্যানের ধন এই প্রেম। সেই দুর্লভ বস্তু ভোগ ক'রে গেল একজন অনিমন্ত্রিত, অখ্যাতনামা মানুষ ? অথচ সুমোহন—

এখন আর কান্না নেই চোখে। মনের মধ্যে অশ্রুর যে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ অবিশ্রাম শোনা যাচ্ছিল, তা' প্রশমিত হয়েছে অনেকটা। স্তিমিত হয়ে

এসেছে বিরহ বেদনার প্রখরতা। এখন আসছে বিচার। মানুষের সঙ্গে মানুষের, দেবতার সঙ্গে দানবের।

সেদিনের সেই চৈত্র সন্ধ্যা......

প্রথম যৌবনের কী জানি কী চাওয়ার মতো উদাস, আর করুণ। তনু-দেহের সন্ধিতে সন্ধিতে বেজে ওঠে যেন কিসের কান্না। চৈতী বাতাসের ধুলো ওড়া পথের মতো মনের মধ্যটা এলায়িত আলস্যে উদাস। কী যেন ঘটবে, কার যেন আসবার কথা ছিল, এলোনা। মাঠের প্রান্তে অশোক-পলাশের রক্তিমার আড়ালে-কোকিলের ডাক। মৌমাছির নেই তিলার্দ্ধের অবসর। চিত্ত তার বিভ্রান্ত ফুলের অজস্র নিমন্ত্রণে। চারিদিকে এত সজ্জা, এত লজ্জার মাঝেও গুন্ গুন্ ক'রে গান ওঠে মনে—"সখি! রোদন ভরা এ বসন্ত কখনো আসেনি বুঝি আগে।"

চৈতী বেলার সেই অপরাহ্নে......সূর্য যখন অস্তে যাবো যাবো......সেইদিন, সেই সময় এলো সুমোহন। গায়ে ধপ্ধপে শাদা চূড়ীদার পাঞ্জাবী, তার ওপর আধ ইঞ্চি কালো বর্ডারের মাদ্রাজী শাদা চাদর, পায়ে শাদা রঙের নাগ্রা। কোথায় ছিল তখন মীনা?

মীনা ছিল ছাদে। চুপ ক'রে একখানি আরাম চেয়ারে শুয়ে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল বিরাট আকাশের দিকে, যেখানে টুক্‌রো টুক্‌রো মেঘে সূর্যের অন্তিম আদরের মাখামাখি।

ওদের বাড়ীটা একেবারে শহরের শেষ প্রান্তে। সেখান থেকেই আরম্ভ হয়েছে সুবিশাল মাঠ। মাঠের দিগন্তে গাছের সারির তলার দিকটায় তখন অন্ধকার নেমেছে। কী বিচিত্র দৃশ্য। ওপরে আলো, নীচে অন্ধকার......মাঝে মাঝে শব্দের তরঙ্গে ভেসে আসছে কোকিলের ডাক...। এমন সময় নীচে থেকে খবর এলো—দিদি! শীগ্গির নীচে আয়। সুমোহনদা এসেছে।

—কে সুমোহনদা? সুমোহন কেরে বাবা?

—কোলকাতা থেকে। মনে হচ্ছে তোর শমন দিদি।

—আমার শমন? তা' মোহন যদি শমনের বেশে এসে থাকে, বলার কী আছে তাতে? মেনে নোব।

—রাজী?

—রাজী।

—বাঃ, কী মজা। হাততালি দিয়ে উঠলো আরতি। তাহ'লে রসুনচৌকি বায়না করতে বলি বাবাকে। অথ বিবাহ ঘটিত? ওরে দিদি! তুই একী কথা শোনালিরে?

—কী ইয়ার্কি করিস!

—আয় দিদি, নীচে আয়।

—চল্! ঝাঁঝিয়ে উঠলো মীনা।

সন্ধ্যার পরে সেদিন ঝির ঝির ক'রে একটা দক্ষিণে হাওয়া উঠতেই ওরা দু'জনে গিয়ে বসলো। মাত্র কয়েক ঘণ্টা হল এসেছে সুমোহন। কিন্তু এরই মধ্যে তার সঙ্গে কিছু অন্তরঙ্গ কথা কইতে ইচ্ছে করছে মীনার।

সুমোহন অত্যন্ত লাজুক। অপ্রয়োজনে সে একটি কথাও বলে না। অকারণে করেনা কোন কাজ। তারা ভরা আকাশের নীচে দু'জনে চুপ ক'রে অনেকক্ষণ বসে রইল। আরও অনেক পরে সুমোহন কইলো কথা......

—আপনি পড়ছেন তো—না?

—হ্যাঁ।

—এখানেই'তো কলেজ আছে—না?

—হ্যাঁ।

—কোনরকম অসুবিধে হয়না?

—নাঃ!

কী রকম মানুষ! এসেই লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করে? এরপর নামতা না জিজ্ঞাসা ক'রে বসে! তবু কৌতূহলের বশে প্রশ্ন করলো মীনা।

—আপনি! আপনি কী করেন কোলকাতায়?

—আমি? আমি ছোটখাটো একটা ব্যবসা করি।

—কিসের ব্যবসা ?

—গ্লাস ফ্যাক্টরী।

এক মুহূর্তের জন্য মীনার মন বিরূপ হয়ে এলো। তার সেই অনেক কালের স্বপ্নে দেখা পুরুষ, জগৎ জোড়া যার নাম, যে হবে সাহিত্যিক, সম্ভব হলে নোবল্ লরিয়েট, পথের দু'ধারে দাঁড়ানো লোক, যাকে দেখবামাত্র হাত তুলে নমস্কার করবে, সে হবে তার দয়িত, তার স্বামী। তা নয়……কাচের ফ্যাক্টরী—জলখাবার গেলাস আর ডিশ বানাবে……

—গান গাইতে পারেন ?

—হ্যাঁ।

—রান্না করতে শিখেছেন নিশ্চয় !

—হ্যাঁ।

—যদি হঠাৎ গভীর জঙ্গলের মধ্যে—ধরুন হাজারীবাগে বেড়াতে গিয়ে—আচম্‌কা কোন বাঘ কি বদ্‌মাইসের হাতে পড়ে গেলেন, সঙ্গে বন্দুক আছে, চালাতে পারবেন ?

—হ্যাঁ-আ-আ !

—ভেরি গুড্ ! 'আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা করার নেই।

সেই রাত্রেই সুমোহন তার নিজের মতামত, অর্থাৎ মীনাকে বিয়ে করতে তার কোন আপত্তি নেই, জানিয়ে দিলে।

বিচিত্র অনুভূতি…। কী যেন সব ওলট্-পালট্ হয়ে গেল মীনার জীবনে। কথা রইল—মীনা পাশ করলে বিয়ে হবে। ইতিমধ্যে মীনা যাবে কোলকাতায় পড়তে। তাকে দেখাশোনা করবে সুমোহন।

ব্যর্থ।…ব্যর্থ…ব্যর্থ। এ যেন সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যুর মার। ব্যূহে সে কেমন ক'রে ঢুকেছিল, সে কথা মনে নেই, কিন্তু বেরিয়ে আসতে গিয়ে প্রাণ দিতে হল……

কমলেশের তৈরী মরণব্যূহে কখন মীনা কেমন ক'রে ঢুকে পড়েছিল মনে নেই, কিন্তু আজ মুক্তির জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে দেখছে, দশদিকে দশটি দিক্‌পালের রুদ্র চক্ষু। মরণ ছাড়া মীনার আর কোন উপায় নেই। মরণ...মরণ...মরণ... মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান......

ভোর হ'ল

মীনা ঘুমিয়ে পড়েছিল। বংশীর ডাকে ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো। দেখলো বংশী এক কাপ ধূমায়িত চা হাতে নিয়ে তাকে ডাকছে। বংশীর চোখে বিস্ময়। যে বিস্ময় দেখে মীনার আজ লজ্জা পাওয়া উচিত।

—দাদাবাবুর চা নিয়ে ঘুরছি। দেখাই পাচ্ছিনে।

—নেই ঘরে? মীনা গলাটা সহজ করবার চেষ্টা করছে।

—নাতো। ঘরে তো নেই-ই, বাড়ীতেও নেই যে। ওঁর বাইরে বেরুবার 'সু' টাও নেই।

—তাহ'লে কোথাও গেছেন হয়তো। আসবেন এখুনি।

—এক ভদ্রলোক এসে বাইরে বসে আছেন অনেকক্ষণ থেকে।

—কে? মীনা উদ্বিগ্ন হলো। সেই কাবলীওলা?

—না না। ইনি আমাদের বাঙালী। বেশ প্যাণ্টট্যাণ্ট আছে পরনে। ভাল চেহারা। আমি বললাম তিনি ভোর বেলায় বাইরে গেছেন। উত্তরে তিনি বললেন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একটু দেখা করবো। তাই বসিয়ে রেখেছি।

—নিয়ে এস তাঁকে। চা দিয়েছ?

—হ্যাঁ।

—নিয়ে এস।

বংশী চলে গেল। মীনা ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলো। ফাঁকা......ফাঁকা......সব ফাঁকা, সব শূন্য। এত দিনের সাধ দিয়ে, সাধ্য দিয়ে, স্বপ্ন দিয়ে আর কল্পনা দিয়ে গড়া মীনার নীড় আজ এক কথায় একটি মাত্র লোকের খেয়াল খুসীতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। এই খাট থেকে আরম্ভ ক'রে ওই

দেওয়ালের চুনকাম পর্যন্ত সব অর্থহীন, সব ব্যর্থ। ব্যর্থ-ব্যর্থ-ব্যর্থ। জীবন—যৌবন আশা-ভরসা-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব ডুবে গেল অনিশ্চয়তার অন্ধকারে।

মোচড় দিয়ে ওঠে বুকের মধ্যটা। কী ক্ষতি করেছি আমি তোমার? আমাকে এই ভাবে ছেঁড়া জুতোর মত ঠেলে ফেলে চলে গেলে কেন তুমি!···আমার মনে কষ্ট দিয়ে তুমি সুখী হবে ভেবেছো? সুখ পৃথিবীতে এত সুলভ? সুখ কি বাজারে কিনতে পাওয়া যায়?

কী মূল্য পেয়েছি আমি তোমার কাছ থেকে এই মিথ্যে প্রেমের ছলনাটুকু কিনতে? ভাবতে পার সে মূল্যের পরিমান? ভাবতে পার কী বিপুল ত্যাগের ওপর আমি আসন পেতে বসেছিলাম তোমার পূজা করব বলে? জান তুমি? জানোনা।

কাপড় জামার আলনায় যেখানে দু'দিকে কমলেশের দু'টি কোট ঝুলতো, সেই ফাঁকা জায়গাটার দিকে চেয়ে হু হু ক'রে উঠলো মীনার বুকের মধ্যে। পেটের মধ্যে এত পাক দিচ্ছে! মনে হচ্ছে খুব খানিকটা বমি হবে হয়তো!

বাইরে জুতোর শব্দ শোনা গেল। চট্ ক'রে আঁচল দিয়ে চোখ দু'টি মুছে নিয়ে মীনা ঠিক হয়ে বসলো। ঘরে ঢুকলেন একজন অচেনা ভদ্রলোক। যাকে মীনা কোনদিন দেখেনি। সে হাঁ ক'রে এই নবাগতের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

—নমস্কার! আপনি বোধ হয় মিসেস রায়? মীনা কোন উত্তর দিচ্ছে না দেখে তিনি আবার বললেন, আমার নাম সুখেন সরকার। আমি এ্যাটর্ণী। কমলেশ আমার বন্ধু। আর সে বন্ধুত্বও আজ থেকে নয়, প্রায় ছেলেবেলা থেকে। এই বলে একটু থেমে সুখেন আবার শুরু করলো, কমলেশ নেই বাড়ীতে?

—না। উনি খুব ভোরে উঠে কোথায় যেন বেরিয়েছেন। আমায় বলে যাননি বলে আমি ঠিক বলতে পারলাম না। মানে—

—বুঝেছি। বিনয়ে গদগদ হয়ে উঠলো সুখেন। কালকে হঠাৎ অনেক কাল পরে ওর সঙ্গে দেখা। অসাবধান মানুষ তো চিরকালের। কবি হলে যা হয় আর কি। গাড়ীর, মানে ট্যাক্সির মধ্যে পার্সটি ফেলে রেখে নেমে চলে এসেছে। শেষকালে আমার কাছ থেকে দু'শো টাকা নিয়ে ইজ্জৎ বাঁচায়। এই অবধি বলে সুখেন হি হি ক'রে হাসতে লাগলো।

—আপনি একটু বসুন। আমি আপনার চা বলে দিয়ে আসি!

—না না থাক—চা আবার কেন?

—তা হোক। এই বলে মীনা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে এক কাপ চায়ের কথা বংশীকে বলে দিয়ে এসে আবার বসলো।

—কালকে ওকে দেখে জানেন মিসেস রায়, অনেক দিন আগের অনেকগুলো কথা মনে পড়ে গেল। উষার সঙ্গে যখন ওর বিয়ে হয়, তখন সেই বিয়ের সভায় কী কাণ্ডই না করলো। এতই লাজুক যে ভাল ক'রে শ্বশুর-শাশুড়ী আর শালাজদের সঙ্গে কথাও বলতে পারেনি তখন। শ্বশুর বাড়ীর সম্পর্কে ওর লজ্জাটা বোধ হয় কাটে আশীষ আর রাতুল হবার পরে। কী হল মিসেস রায়? আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?

—না-না। অনেক ধন্যবাদ। মাথাটা কেমন যেন ঘুরে উঠলো তাই। বহুকষ্টে নিজের বিকৃত স্বরকে জয় ক'রে বললো মীনা। ও কিছু না। আপনি বলে যান।

—ছি ছি! আমি আর ডিসটার্ব করবো না আপনাকে। আপনি অসুস্থ বোধ করলে শুয়ে পড়ুনগে। শুধু কমলেশকে বলবেন যে কবে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল সে কথাটাই আমি ভুলে গিয়েছি বলে সকালে খোঁজ নিতে এলাম। এই ঠিকানাটা যা ক'রে পেয়েছি—সে আর বলবেন না। ভোর বেলায় পার্থ বলে একটি ছেলে—তার বাড়ী আমাদের ঠিক পাশের বাড়ী। তার সঙ্গে কথা হতেই সে বললো কাল রাত্রে কমলেশের পকেট থেকে দু'একখানা কাগজ পড়ে গিয়েছিল —তারই একটাতে বুঝি এই ঠিকানাটা ছিল। তাই—মানে আমাকে আজ সন্ধ্যা-বেলায়, না কাল সন্ধ্যাবেলায় কবে যে খেতে নিমন্ত্রণ ক'রে এল, সেটা যেন আমাকে একটু দয়া ক'রে বলে দিয়ে আসে। চিরকালের চাল্লুস্তো। যা বলে তা করে না, আর যা করে তা কিছুতেই বলবে না। যাই হোক, বলে দেবেন একটু। কেমন! নমস্কার!

এই বলে উঠে দাঁড়িয়ে সুখেন মীনার দিকে চেয়ে আর একবার হাসলো।—আপনার কথাও অনেক বলেচে কালকে। সবটা অবিশ্যি আমি বিশ্বাস করিনি।

কিন্তু এখন আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে—বিশ্বাস না করাটা উচিত হয়নি। হেঁ হেঁ হেঁঃ, আচ্ছা নমস্কার।

—নমস্কার! বলবার চেষ্টা করলো মীনা, কিন্তু শব্দ বেরোলনা। থেকে থেকে শরীরের মধ্যেটা কী রকম যেন শিউরে উঠছে। খুব একটা কুৎসিত রকমের ডিসেক্‌শন হচ্ছে কোথাও। এই তোমার স্বরূপ! এই তুমি কবি? চারদিকে মিথ্যে কথা বলে ঋণের প্রাচীর গেঁথে তুলেছ! হায়! হায়! হীরেকে তুমি ছুঁড়ে ফেলে দিলে মাটিতে! আমার প্রেম—যার এক কণা পাবার জন্য বাংলার শ্রেষ্ঠ ছেলের দল এক কথায় প্রাণ দেবে, তাকে আমি তুলে দিলাম তার হাতে, আর তাকে তুমি কিনা মুঠোর মধ্যে দলে দলে নিঃশেষ করলে!

চোখে আর জল আসছেনা। পরিবর্তে ধীরে ধীরে মনের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর প্রতিহিংসা উঁকি মারছে। প্রকাশ্য আদালতে তোমাকে অভিযুক্ত ক'রে লক্ষ লোকের চোখের সুমুখে আমি তোমাকে হতমান করবো? না—বাবার দেওয়া—শংকর মাছের ল্যাজের চাবুকখানা বার ক'রে রাস্তার মাঝে দিনের আলোতে মারতে মারতে তোমার—মুখময় লম্বা লম্বা কালো কালো দাগ ক'রে দেব। কী করবো? কী করবো? কী করবো?

বংশী এসে দরজার কাছে দাঁড়াল আবার। তারও মুখে যেন আজ একটা উদাস বিষণ্ণতার ছাপ। তার দিকে চেয়ে স্নিগ্ধ হয়ে এল, নরম হয়ে এল মীনার মন। মনে হল—এই আর একটা লোক। সমস্ত আনুগত্য দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে, একটা বিশ্বাসঘাতকের সেবা করেছে। আশ্চর্য! মানুষ চেনা কী কষ্ট!

—কী বংশীদা? বললো মীনা।

—আর একজন ভদ্রলোক এসেছেন। বাবু বাড়ী নেই শুনে তিনি একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

—আমি কী করতে পারি বলতো বংশীদা। মীনা কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো।—তিনি যদি যাবার সময় আমার কাছে ঠিকানা না রেখে যান—আমিতো জ্যোতিষ জানিনে, যে—

—বলে দিই, দেখা হবেনা?

—না, না, কী জানি কে লোক। যদি উনি ফিরে এসে একথা শুনে রাগ করেন, তাহ'লে? তুমি ডাকো তাঁকে। দেখি কী বলেন!

বংশী নীচে নেমে গেল। একটা কী যে অজানিত আশংকায় ঠক্ ঠক্ ক'রে তারও পা কাঁপছে। মনে হচ্ছে, কোন একটা সর্বনাশ যেন হামাগুড়ি দিয়ে চুপি চুপি এগিয়ে আসছে এবাড়ীর দিকে; যে কোন মুহূর্তে ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ওপরের ঘরগুলোও ফাঁকা-ফাঁকা, নীচের উঠানটাও যেন থম্ থম্ করছে—কী জানি কি হচ্ছে আজ!

নীচে আর কেউ নয়, অপেক্ষা করছিল জগমোহন—দি পেপার মার্চেণ্ট। অত্যন্ত অলৌকিক উপায়ে সে আজ কমলেশের ঠিকানা পেয়েছে। তার রাত্রিবাসের জায়গা থেকে ভোর বেলায় উঠে সে বাথরুমে যাবে বলে বারান্দায় সগহাতে পায়চারী করছিল, এমন সময় ঘুম ভেঙ্গে পার্থও বাইরে আসে। কথায় কথায় গত রাত্রের বন্ধুর কথা উঠে পড়ে। জগমোহন বলে—উনি আমার বড় খদ্দের মশায়। জানেন, উনি কোথায় থাকেন? হায়দ্রাবাদের নিজামের কোলকাতায় যে বাড়ী আছে—

বকাবেননা মশায়। এই বলে পার্থ ভেতরে ঢুকে এক খণ্ড আধখানা ক'রে ছেঁড়া লেটার হেড নিয়ে আসে, এবং সেইটি জগমোহনের সামনে মেলে ধরে বলে—

—নিজাম ফিজাম বাজে কথা, এই দেখুন ওর ঠিকানা। বুঝেছেন? ওসব শরতের মেঘ মশায়। যত গর্জায়, তত বর্ষায়না। বুঝেছেন?

অতি সন্তর্পণে সেই ঠিকানাটি আর পূর্বরাত্রে লিখিত চেকখানি নিয়ে জগমোহন যায়—সেই ভদ্রলোকের কাছে, যার নাম অম্বিকাচরণ সমাদ্দার যিনি গতদিন জগমোহনের চেকখানি নিয়ে একটি বেয়ারার চেক তার নামে লিখে দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। জগমোহন ভোরে তাঁকে আর একখানি চেক দেখাতেই তিনি হেসে উঠলেন।

—হাসছেন কেন মশায়? এই চেকের মধ্যে কি লাফিং গ্যাস্ আছে? বিরক্ত হয়ে জগমোহন বললে।

—না—না. লাফিং গ্যাস নয়, আপনাকে ব্লাফিং গ্যাসে ধরেছে দেখে হাসছি। আরে মশায়, এর একটি কাণাকড়ি ব্যাংকে নেই।

—নেই!

—না। কালকেইতো শুনলেন।

উঁহু, আমায় যে কমলেশবাবু বললেম ময়লা কাপড়-জামা পরে যাওয়াতে ব্যাংকের কর্মচারীরা টাকা দেয়নি।

অম্বিকাচরণের বয়স হবে ৫৫, ৫৬। তিনি এই বয়সে এমন একটা অদ্ভুত হাস্যকর কথা শোনেননি। ফলে জগমোহন এই কথা বলা মাত্র তিনি হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। মিনিট পাঁচেক থেকে থেকে দমে দমে হাসবার পর তিনি বললেন—নাঃ। তাঁর কোন টাকা পয়সা নেই ব্যাংকে, এইটেই কারণ, অন্য কিছু কারণ নয়।

ধীরে ধীরে এই পোড় খাওয়া পেপার মার্চেণ্টের নাতি-শীতল রক্ত একেবারে মাথায় উঠে গেল। আর কোন কথা না বলে একেবারে সোজা পার্থ-প্রদত্ত ঠিকানায়। বংশী বেরিয়ে বললো—বাবু নেই বাড়ীতে।—থাকবেনা আমি জানি। ঝাঁঝিয়ে উঠলো জগমোহন।—তার বৌয়ের সঙ্গে দেখা করবো আমি। যাও, বলে এসো।

অবাক বংশী খানিকক্ষণ জগমোহনের মুখের দিকে চেয়ে বোঝবার চেষ্টা করলো লোকটা পাগল কিনা! তারপর ওপরে গিয়ে ফিরে এসে জগমোহনের দিকে তাকিয়ে বললো—আসতে আজ্ঞা হোক।

গট্ গট্ ক'রে জগমোহন ভেতরে ঢুকে দুম্‌দাম্ ক'রে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো···

পর্দা ঠেলে ভেতরে পা দিয়েই জগমোহনের ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে একটা বরফ গলা জলের সরু ধারা শির শির ক'রে নামতে লাগলো—শরীরের ভেতর দিয়ে। মীনার দিকে অপলক চেয়ে থেকে দু'তিনবার শিউরে উঠলেন। যে সব কথা তার মাথার মধ্যে টগবগ ক'রে ফুটছিল, সব যেন কেমন জট পাকিয়ে খেই হারিয়ে

গেল। কিছুক্ষণ মীনার দিকে চেয়ে থাকার পর সে খুব নরম গলায় বললো—নমস্কার!

—নমস্কার। বললো মীনা। সে খুব মন দিয়ে লোকটার আবয়বিক এই পরিবর্তন লক্ষ্য করছিল, তাই মিষ্টি ক'রে বললো—

—বসুন।

—হ্যাঁ বসি। জগমোহনের সম্বিৎ ফিরে এসেছে। সে ভাবতেই পারেনি যে টাকা না দিয়ে পালিয়ে যাওয়া কাগুজে কমলেশের বৌ এরকম সুন্দরী হতে পারে। তাই ধাক্কাটা একটু বেশী লেগেছিল। জগমোহন বসলো, এবং আবার মীনার দিকে চেয়ে রইল।

—ওঁর বোধ হয়—জগমোহনের চাউনিতে বিব্রত হয়ে মীনা কথা শুরু করলো।—ওঁর বোধহয় ফিরতে দেরী হবে। আপনার তাঁকে জানাবার মত কোন কথা থাকলে—আর আপত্তি না থাকলে আমাকে বলে যেতে পারেন,—আমি তাঁকে বলবো।

—হ্যাঁ। বলবেনই তো! মানে, আমি কিছু টাকা পাবো!

—আপনিও পাবেন? নিজের অজান্তে মীনা বলে উঠলো।

—হ্যাঁ বেশী নয়, গোটা চল্লিশ টাকা। কিন্তু এই টাকা আদায় করতে আমার কাল ঘাম ছুটে গেল মশায়!

—কিসের টাকা এটা? ক্লান্ত কণ্ঠ মীনার।

—ওই যে গুরুদক্ষিণে না কি যেন একটা কাগজ বের করেছিল—আমার গুষ্টির পিণ্ডি, তারই কাগজের দাম।

—ও! "নরের মাথায় শ্রমের পসরা"—আহা! মুহূর্তকালের জন্য মীনার স্থান কাল পাত্র ভুল হয়ে গেল। ভুলে গেল সদ্য পরিত্যক্তা নারীর মর্মবেদনা—ভুলে গেল সব। ঠিক এই সময়টা যদি কমলেশ এই ঘরে এসে দাঁড়াতো, তাহ'লে মীনা দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে আবার তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলতো—"লহ, লহ, যাহা আছে, সব কিছু লহ জীবনবল্লভ!"

—তাহ'লে, কী বলে গিয়ে আমার টাকাটা—। জোচ্চুরীর কায়দাটা

একবার দেখলুম! চেক দিলো একখানা,—হল ফেরৎ, তা কাল রাত্রে বলে কিনা,—তুমি ধোয়া কাপড় জামা পরে যাওনি তাই তোমায় টাকা দেয়নি!

—কাল রাত্রে কোথায় দেখা হয়েছিল আপনার সঙ্গে তাঁর?

এইবার জগমোহনের মতো মানুষকেও ঢোক গিলতে হল। আজ্ঞে মা জননী, দেখা হয়েছিল সোনাগাছিতে

—সোনাগাছি! সে কোথায়?

—আজ্ঞে ওটা হল, কী বলে গিয়ে—ওইখানে আমার আবার একটি দ্বিতীয় সংসার আছেন কিনা! তা' কমলেশবাবুও গিয়েছিলেন আমাদের পার্থবাবুর মেয়েমানুষের ঘরে। পাশাপাশি ঘর। তাই দেখা হয়ে গেল!

এ কী ভাষায় কথা বলছে জগমোহন? মীনা ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে আছে তার মুখের দিকে। একী অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য আর অবিশ্বাস্য কথা বলছে জগমোহন! কমলেশ কাল রাত্রে গিয়েছিল ব্রথেল কোয়ার্টারে:! ব্রথেল—!

উঃ! কী ভীষণ গরম লাগছে। এই পাপকে এখুনি বিদেয় করা দরকার। নিঃশব্দে মীনা নিজের গলায় হাত দিয়ে হারটাকে খুলে ফেললো। তারপর শান্ত গলায় বললো—

—আপনাকে নগদ টাকা দেবার সামর্থ আজ আর আমার নেই। উনি যে দেনা করেছেন, আমি তা শোধ দিতে বাধ্য। আমার এই হারটা নিয়ে যান, এটা বিক্রী করলে বোধ হয় আপনার টাকাটা হয়ে যাবে।

—না-না, মা! আমি আপনার গয়না কেন নেব? ছি ছি! দেবেন, আপনি না হয় দু'দিন পরেই দেবেন! আহা! কী মন আপনার মা! ওই মানুষের এই স্ত্রী! থাক-থাক!

—না, আপনি নিয়ে যান।

—কিন্তু এর যে অনেক বেশী দাম হবে!

—বাকী টাকাটা আপনার কাছে জমা রাখবেন। উনি আবার যদি কোন-দিন কাগজ বার করেন, তখন কাগজ দিয়ে শোধ ক'রে দেবেন। নিন—ধরুন!

যন্ত্রচালিতের মতো জগমোহন হারটা হাতে নিলো। মীনা তৎক্ষণাৎ, উঠে

দাঁড়িয়ে বললো—নমস্কার! অবাক জগমোহন নিরুপায়ের মতো উঠে দাঁড়াল এবং মীনার মুখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড হাঁ ক'রে চেয়ে রইলো—তারপর কোন কথা না বলে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ছুটে বসবার ঘর থেকে শোবার ঘরে এসে বিছানার উপর আছাড় খেয়ে পড়লো মীনা। তারপর—ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। এ কান্নার কোন কারণ নেই, শুধু কাঁদতে হবে এই অনুভূতির তাগিদে কান্না। 'হু হু' ক'রে চোখের জল ঝরে বিছানা বালিশ সব ভিজে গেল। কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে পড়লো মীনা। কাঁদতে কাঁদতে তার স্নায়ুতন্ত্রী সব শিথিল হয়ে এল। এইভাবে যদি ও মরে যেতো। যদি আর না উঠতে হতো। যদি এই-ভাবে এই বিছানায় ধীরে ধীরে মৃত্যু এসে অধিকার করতো তার সর্ব-দেহ-মন, তাহ'লে কী ভালই হতো! আরতো তাকে নতুন ক'রে জগতের কাছে এই কালোমুখ দেখাতে হতোনা। আজ এই সময় ঘরে যদি একটু বিষও থাকতো!

ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লো মীনা। একটু পরে এক কাপ কফি হাতে ক'রে বংশী ঘরে ঢুকে দেখলো মীনা ঘুমুচ্ছে। এ সময় কখনই সে ঘুমোয় না! কিন্তু আজ বংশী কেমন ক'রে বুঝে নিয়েছে যে, এ বাড়ীতে দুর্যোগের দিন শুরু হয়েছে...। সে চাকর, মনিবের ব্যক্তিগত ব্যাপারে তার কোন কথাই বলা বা ভাবা উচিত নয়। কিন্তু তবুও কেন জানা নেই,—কমলেশের প্রতি একটা অপরিসীম বিদ্বেষে তার মন ভরে উঠেছে। এই সোনার প্রতিমাকে যে দুঃখ দেয়, যে কাঁদায়—সে আর যেই হোক, মানুষ নয়। ছি!

কফির পেয়ালাটি হাতে ক'রে বংশী ফিরে গেল তার রান্নাঘরে। আজ সকালে আর কোন কাজ নেই, কোন তাড়া নেই। বাড়ীর বিষণ্ণ শূন্যতার উপর দিয়ে সময়ের স্রোত মন্থর গতিতে চলেছে। উনুনে কয়লা দেবার দরকার নেই, বাবু আজ দশটার মধ্যে খেয়ে বেরোবে না। কেউ নেই, কিছু নেই।...চুপ ক'রে রান্নাঘরের দাওয়ায় গিয়ে বসে রইল বংশীধর, মীনার প্রবঞ্চিত জীবনের একমাত্র অকৃত্রিম বন্ধু....

সূর্য উঠছে

মীনা ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল কমলেশ ফিরে এসেছে। তার বিছানায় বসে বলছে—আমার কি তোমাকে কোন ঠাট্টা করবারও অধিকার নেই? এরই মধ্যে এইভাবে কেঁদে কেটে অনর্থ করেছো তুমি? তুমি কী? এই বলে সে নিজের মুখখানিকে মীনার মুখের দিকে নামিয়ে আনছে···। মীনা ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বলছে—

—কী যে করো তুমি! সময় মানো না কেন? এখুনি বংশীদা এসে পড়বে যে!

—মীনা! মীনু! খুকুরে!

বিদ্যুদ্বেগে ঘুম ভেঙ্গে বিছানার উপর উঠে বসলো মীনা! পূর্বজন্মের ওপার থেকে কে ডাকে তাকে 'খুকুরে' বলে। এ ডাকতো···তার বাবার।

কী অদ্ভুত স্বপ্ন! ক্লান্ত মস্তিষ্কের শব্দকোষে পুরাতন প্রিয়জনের কণ্ঠ রেকর্ড করা থাকে, এ হচ্ছে তারই প্রতিধ্বনি!

—খুকু! কোথায় তুই? আবার স্বর ভেসে এল।

মীনা অভিভূতার মতো উঠে দাঁড়াল বিছানা থেকে। একী! এসব কী শুনছে সে? ক্রমাগত বাবার গলা কেন কানে বাজছে তার? তবে কি তাঁর কোন অসুখ-বিসুখ করলো। রোগশয্যা থেকে তিনি খুকুরে বলে ডাকছেন আমাকে?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছে। আবার আওয়াজ এল খুকু! কইরে তুই?

—বাবা! আর্তকণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠলো মীনা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের পরদা ঠেলে ঢুকলেন তার বাবা আর অনুদি। 'বাবা' বলে একটা অস্ফুট শব্দ ক'রে মীনা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার পিতার বুকে। সবলে দক্ষিণবাহু দিয়ে তিনি বেষ্টন করলেন কন্যার দেহ। থর থর ক'রে কাঁপছে মীনার তনু দেহ। এই ভাবে নীরবে কাটলো কিছুক্ষণ।

—অনু!

—কাকাবাবু! অনুরাধা চোরের মতো এগিয়ে এলো তাঁর কাছে।

—একী হয়েছে ওর চেহারা। রোগা হয়ে গেছে. কালো হয়ে গেছে! চোখের নীচে কালি। ওকে তো আর চেনাই যায় না! এই বলে মীনার বাবা অনুরাধার দিকে চাইলেন।

—চেহারা মানে—আমতা আমতা ক'রে বললো অনুরাধা—চেহারা অবিশ্যি খারাপ হয়েছে ওর একটু—

—একটু! গর্জন ক'রে উঠলেন মীনার অভিভাবক। একটু কী বলছিস অনু? এর নাম একটু খারাপ হওয়া? এই বলে তিনি মীনার মুখখানিকে বাঁ হাত দিয়ে উঁচু ক'রে ধরলেন। এই চেহারার কোনখানটায় ওর আগের মুখের ছাপ আছে, আমায় বল দিকিনি! এসব কী ব্যাপার? উঁ? একি কুমারী মেয়ের মুখ? না, তিন চারটে ছেলের মায়ের মুখ? কী রে! জবাব দিচ্ছিস্‌নে কেন?

থর থর ক'রে কেঁপে উঠলো অনুরাধার পা দু'খানি। তার মনে হল বোধ হয় ভূমিকম্প হচ্ছে। সে হতাশ ভাবে দরজার দিকে চাইল। তাদের সঙ্গেই বাড়ীতে ঢুকেছে সুমোহন। সেই বা ঘরে আসতে এত দেরী করছে কেন? সুমোহনের এ্যাটিচ্যুড্‌ আজ সকাল থেকেই তার ভাল লাগেনি। কেমন যেন অন্যমনস্ক, কেমন যেন ছাড়া ছাড়া গম্ভীর গম্ভীর। তবু এই সময়, এই প্রশ্নবাণের মুখে সে উপস্থিত থাকলে তবু দু'জনে মিলে যা হোক উত্তর দেওয়া যেতো, কিন্তু সেও তো দেরী করছে।

মীনার পিতা গিয়ে বিছানার প্রান্তে বসলেন। তারপর গম্ভীর মুখে ঘরের সমস্ত বস্তু পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলেন যেন। হঠাৎ বললেন—

—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে অনু! সুমোহন!

—আজ্ঞে যাই! নীচে থেকে উত্তর এল।

ফাঁসীর আসামীর মতো চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে মীনা। জগতে সত্যবস্তু হচ্ছে একমাত্র বাবার আদেশ। এখুনি—সুমোহন এলেই সত্য উদঘাটিত হয়ে পড়বে। তারপর? তারপর যাকনা পৃথিবী রসাতলে। তাতেই বা কী? বাবা সন্দিগ্ধ

চোখে ডবল বেডের দিকে চাইছেন, একটা তীব্র তীক্ষ্ণ বিরক্তিতে ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠছে মাঝে মাঝে। ভগবান! রক্ষা করো।

সুমোহন দ্রুতপদে ঘরে ঢুকলো। মুহূর্তকালের জন্য চোখোচোখি হল মীনার সঙ্গে তার। পরক্ষণে চোখ দু'টিকে মীনার মুখের থেকে সবলে ছিনিয়ে নিয়ে মীনার বাবার দিকে চেয়ে বললো—

—আমায় ডাকছেন?

—হ্যাঁ। আমার প্রশ্নে অনুরাধা কী রকম যেন নার্ভাস হয়ে পড়েছে বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে। তুমি বলতে পারো?

—কী বলুন!

আমার প্রথম কথা হচ্ছে—হস্টেল ছেড়ে মীনু এখানে কেন? এতবড় একখানা বাড়ী নিয়ে ও করছে কী?

বিদ্যুৎ চমকেছে···এইবার বাজ পড়বে। ভয়ে মীনা আর অনুরাধা চোখ বন্ধ করলো। তখুনি শুনতে পেল সুমোহন বলছে—

—হস্টেলে থেকে ওর পড়াশুনার অসুবিধে হচ্ছিল বলে—আমিই ওকে এখানে এই বাড়ীতে এনে রেখেছি। একলা একটা বাড়ীতে থাকলে মনটাও খানিকটা মুক্তি পায়, এইজন্যে—

—'আই সি।···তুমিই তাহ'লে ওকে এইখানে এনে রেখেছো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সুমোহন সোজা চেয়ে আছে তাঁর দিকে।

—কতদিন ও এইভাবে একলা বাস করছে?

—তা বছর খানেকের ওপর হয়ে গেল। কিন্তু সব সময় তো একলা থাকতে হয় না, বংশীধর বলে একজন বিশ্বাসী চাকর আছে, তা'ছাড়া আমিও এসে মাঝে মাঝে থাকি—যাতে ও লোন্‌লি ফিল্‌ না করে—আর—

—ও! তুমিও এসে মাঝে মাঝে থাকো? এই বলে তিনি নিজের অজান্তেই ডবল বেডের দিকে চাইলেন। তৎক্ষণাৎ সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে তাড়াতাড়ি বল্‌লেন—ছাটস্‌ অল রাইট। কিন্তু এভাবে আলাদা একটা বাড়ী নিয়ে—

—না, আর দরকার হবে না। আমি কালকে এসে ওকে বলে গেছি—

জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে। কেননা, আজকে আমার বোন লাবুর বিয়ে। বিয়েতেও যাওয়া হবে, আর—এখন থেকে আমার ওখানেই থাকবে।

—কাল থেকে তোমার ওখানেই থাকবে? আজকে লাবুর বিয়ে, তা—আইডিয়াটা মন্দ নয়। কী যেন বিড় বিড় ক'রে বকলেন তিনি নিজের মনে—তার পর হঠাৎ সুমোহনের দিকে চেয়ে বললেন—

—সকাল থেকে খেয়েছ কিছু?

—আমি? আজ্ঞে না। মানে, সময় পেলাম না তাই—

—তাহ'লে আজ সারাদিন কিছু খেয়োনা। খুকু, তুই খেয়েছিস?

সে কথা বলবে? কথা বলার শক্তি মীনার নেই। দরদর ধারে দু'চোখ দিয়ে জল পড়ছে, দু'কান ভরে বাজছে সুমোহনের গলায় আরব্য উপন্যাসের আজগুবি কাহিনী। বাপের প্রশ্নে মাথা নাড়লো।

—তাহ'লে তোমরা দু'জনেই উপোস ক'রে থাকো। আজ বিয়ের দিন আছে। আমিও আজ রাত্রেই খুকুকে তোমার হাতে তুলে দেব। অনু!

—কাকাবাবু। কান্না-ভিজে গলায় ফিস ফিস ক'রে উত্তর দিলো অনুরাধা।

তুই একবার চলতো আমার সঙ্গে—বাজারের দিকে। যা পারি, যতটা পারি বাজারটা সেরে ফেলি। আয়! আয়!

এই বলে তিনি অনুরাধার হাত ধরে টেনে হন্ত-দন্ত হয়ে—ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সিঁড়িতে তাঁর সবল পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল।

মীনা দাঁড়িয়েই ছিল, এইবার আর সহ্য করতে না পেরে ছুটে গিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়লো। তার পর সঙ্গে সঙ্গে ছেলে মানুষের মতো শব্দ ক'রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো....

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখলো সুমোহন। এইবার ধীরে ধীরে এসে মীনার পাশে তার কপালে হাত বুলোতে বুলোতে মৃদু গলায় বললো —

—খুব বেশী নষ্ট করার সময় তো আমাদের হাতে নেই মিনু। ঘণ্টাখানেক ঘণ্টাদু'য়েকের মধ্যেই বাবা এসে পড়বেন অনুদিকে সঙ্গে নিয়ে। তার আগে আমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা উচিত নয় কি?

—না—না, আমি— ? ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো মীনা।

—হ্যাঁ হ্যাঁ—তুমিইতো। এত চোখের জলে অবগাহন ক'রেও যদি গায়ে তোমার কোথাও ময়লা লেগে থাকে, তবে থাক সে ময়লা। এখন ওঠো। জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। এই বলে সে মীনাকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বিছানায় তুলে বসালে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে মীনা উঠে গিয়ে আলনায় ঝোলানো তার জাফ্‌রাণী রঙ শাড়ীখানায় হাতে দিলো…

ঠিক সেই মুহূর্তে হাওড়া স্টেশনে ময়নাকে নিয়ে কমলেশ একখানি পশ্চিমগামী মেল ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠে বসলো……

বেলা তখন ঠিক নটা……

শেষ